

ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ

ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ



ଦ୍ଵାଦଶ, ସଂସ୍କରଣ

ଜୁଲାଇ, ୧୯୪୫

rights reserved]

[ସ୍ଵଳ୍ପ ଆର୍ଟ ଆନା

প্রকাশক

স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়,
১, মুখার্জী লেন ৮.৩।

[Copyrighted by the President ,
Ramakrishna Math, Be'howrah.]

প্রিন্টার—

শ্রী অম্বা নাথ বাহা

শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

২৫১, অপর চিংগুট রোড, কলি

ভূমিকা

এই প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজির গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় ; একদলের মতে পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই নিখুঁত ও সৰ্ব্বদুন্দর ; দেশী জিনিষের মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল ইহার ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী; হিন্দুদের এবং হিন্দুসমাজের যে কোন-কিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন ; আর যে পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত পৃথিবীময় আপনার রালত্ব বিস্তার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা তাঁহারা কল্পনাও আনিতে পারেন না। এই প্রবল স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বামীজির এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে, এই আশা করিয়া ইহার পুনর্মুদ্রণ কর' গেল।

আমরা আশা করি, শিক্ষিত বঙ্গবাসিমাত্রেই এই পুস্তকের সমাদর করিবেন। সৰ্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্ত ইহার মূল্য যথাসম্ভব কম করা গেল।

বিজ্ঞাপন

‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।
পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ অনেক দিন নিঃশেষ হইয়াছিল।
নানাকারণে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে বিলম্ব
হইল। পূর্বাগর হইতে এবার অধিক আদর হইবে, আশা
করা যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের হ্রস্বপাত হইতে আমাদের দৃষ্টি নিজ
দেশের প্রতি কিছু আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বদেশভক্তির
মূলভিত্তি সম্বন্ধে এবং পাশ্চাত্যদেশ হইতেই বা কিরূপে তাহাদের
কি কি গুণ গ্রহণ করিলে আমাদের জাতীয় উন্নতি হইতে পারে,
তৎসম্বন্ধে সাধারণের একটা পরিষ্কার ধারণা নাই। কেহ কেহ
পাশ্চাত্য জাতির উপর অযথা বিদ্বেষ-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছেন।
আশা করি, স্বামীজির এই নিরপেক্ষ সমালোচনাগ্রন্থ দ্বারা
লোকশিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইবে।

এবার পুস্তকখানি স্বামীজীর হস্তলিপির সহিত ভাল করিয়া
মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পুস্তকপাঠের সুবিধার জন্ত
কতকগুলি ‘মার্জিণাল নোট’ এবং দুই চারিটি ‘ফুটনোট’ও
সংযুক্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি ‘পাইকা টাইপে’ ও উৎকৃষ্ট
মোটো ‘এ্যাটিক’ কাগজে ছাপা হইল এবং স্বামীজির একখানি
‘হাফটোন’ চিত্র দেওয়া হইল। এই সকল কারণে ব্যয়াদিক্য
হওয়া সত্ত্বেও মূল্য সামান্যমাত্র বৃদ্ধি করা হইল। ইতি—

বশব্দ

প্রকাশক

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সলিলবিপুল! উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দন-
বিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে, অপূর্বকারুকার্য্যমণ্ডিত রত্ন-
বর্ধমান ভার-
তের বাহ-
চবি
খচিত মেঘস্পর্শী মন্দির প্রাসাদ; পার্শ্বে,
সম্মুখে, পশ্চাতে, ভগ্ন মৃন্ময়প্রাচীর জীর্ণা-
চ্ছাদ, দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকূল, ইতস্ততঃ
শীর্ণদেহ ছিন্ন-বসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী,
বালক-বালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্ম্মী সমশরীর গো
মহিষ বলীবর্দ্ধ; চারিদিকে আবর্জনারাশি এই আমাদের
বর্ধমান ভারত।

অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়কোড়ে আবর্জনা-
স্তূপ, পট্টশাটাবৃত্তের পার্শ্বচর কোপীনধারী, বহুব্রতপুত্র
চতুর্দিকে ক্ষুৎকাম জ্যোতিঃহীন-চক্ষুর কাতর দৃষ্টি—
আমাদের জন্মভূমি।

বিস্মৃচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন,
ম্যালেরিয়ার অস্মিমজ্জাচর্কন, অনশন-অর্দ্ধাশন-
পাশ্চাত্যের
চক্ষে প্রাচ্য
সহজ্জভাবে, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ
ভূভিক্তের মহোৎসব, রোগশোকের কুরুক্ষেত্র,
আশা-উদ্ভম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল-পরিপ্লুত মহাশ্মশান,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

তন্মধ্যে ধ্যানমগ্ন মোক্ষপরায়ণ যোগী,—ইউরোপী পর্য্যটক এই দেখ ।

ত্রিংশকোটি মানবপ্রায় জীব—বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত-প্রাণ, দাসশুলভপরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উত্তমহীন, আশা-হীন, অতীত-হীন, ভবিষ্যৎ-বিহীন, ‘যেন তেন প্রকারেণ’ বর্ত্তমান প্রাণধারণমাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ চাতুরীপ্রতারণাসহায়, স্বার্থ-পরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের যমস্বরূপ, বলহীন-আশাহীনের-সমুচিত কদর্যা-ভীষণকুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদণ্ড-হীন, পুতিগন্ধপূর্ণ-মাংসখণ্ডব্যাপি-কাঁটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত—ইংরাজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি ।

নববলমধুপানমত্ত হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়-
 প্রাচ্যের দৃষ্টিতে
 পাশ্চাত্য সহায়, ছলে-বলে-কোশলে পরদেশ-পর-
 ধনাপহরণপরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈকজীবন ;—ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অশুর ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

এই ত গেল উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহিদৃষ্টি-লোকের কথা। ইউরোপী বিদেশী সুশীতল সুপরিষ্কৃত সৌধশোভিত নগরাংশে বাস করেন, আমাদের ‘নেটিভ’ পাড়াগুলিকে নিজেদের দেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরের সঙ্গে তুলনা করেন। ভারতবাসীদের যা, সংসর্গ তাঁদের হয়, তা কেবল একদলের লোক—যারা সাহেবের চাকরী করে। আর, হুংখ দারিদ্র্য ত বাস্তবিক ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ময়লা-আবর্জনা চারিদিকে ত পড়েই রয়েছে। ইউরোপী-চক্ষে এ ময়লার, এ দাসবৃত্তির, এ নীচতার মধ্যে যে কিছু ভাল থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস হয় না।

আমরা দেখি, শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছ-বিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ,—এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু!

হুই দৃষ্টিই বহিদৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না। বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, ‘ব্লেচ্ছ’ বলি,—ওরাও ‘কাল দাস’ বলে আমাদের ঘৃণা করে।

এ ছয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু হু দলেই ভেতরের আসল জিনিষ দেখে নি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র,—ভাষা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

মাত্র। সেইরূপ, প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করছে—সংসারের

স্থিতির জন্ত আবশ্যক। যে দিন সে
 প্রত্যেক
 জাতির
 জীবনোদ্দেশ্য
 বিভিন্ন
 আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে
 জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা
 ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-

বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে যেটা জগতের জন্ত এখনও আবশ্যক। ইউরোপীদের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হলে সংসার চলবে না; তাই ওরা প্রবল। একেবারে নিঃশক্তি হলে কি মানুষ আর বাঁচে? জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র; একেবারে নিঃশক্তি নিষ্কর্মা হলে জাতটা কি বাঁচবে? হাজার বছরের নানারকম হান্ধামায় জাতটা মলো না কেন? আমাদের রীতি-নীতি যদি এত খারাপ, ত আমরা এতদিনে উৎসন্ন গেলাম না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার ফ্রুটি কি হয়েছে? তবু সব হিঁদু মরে লোপাট হল না কেন—অগ্ন্যাগ্ন অসভ্য দেশে যা হয়েছে? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন হয়ে কেন গেল না, বিদেশীরা তখনই ত এসে চাষ-বাস করে বাস করতো, যেমন আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায় হয়েছে এবং

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

হচ্ছে ? তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান্ নিজকে ভাব, ওটা কল্পনা ; ভারতেও বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ—যাঁরা অন্তর্বহিঃ সাহেব-সেজে বসেছ এবং ‘আমরা নরপশু, তোমরা হে ইউরোপী-লোক, আমাদের উদ্ধার কর,’ বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর, যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে হাসেন হোসেন কর্ছ। ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্নিও সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কিনারা পর্য্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী—উনি চীন, জাপান পর্য্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর-মা মেরী করে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

কৃষ্ণানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরির উত্তরে কৈলাস, সেখা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারে নি, ও কি এখন পাদ্রী-ফাদ্রীর কর্ম !! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,—এদেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন ? তোমাদের ছু চারজনের জন্ত দেশ-শুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন হতে হবে বুঝি ? চরে খাওগে না কেন ? এত বড় ছনিয়াটা পড়ে ত রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায় ? ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নেমকহারামি করবেন, যীশুর জয় গাইবেন—আমরি !! ঐ যে সাহেবদের কাছে নাকি-কান্না ধর যে ‘আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ,’ এ কথা ঠিক হতে পারে—তোমরা অবশ্য সত্যবাদী ; তবে ঐ আমাদের ভেতর দেশশুদ্ধকে জড়াও কেন ? ওটা কোনদেশী ভদ্রতা হে বাপু ?

প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোনও গুণ নেই, যা কোনও জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে, কোনও ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি কোনও জাতিতে কোনও কোনও গুণের আধিক্য প্রাধান্য।

আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

‘ধর্মের’। আমরা চাই কি—‘মুক্তি’। ওরা চায় কি—
‘ধর্ম’। ধর্ম-কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে।

প্রাচ্যের উদ্দেশ্য ধর্ম কি? যা ইহলোকে বা পরলোকে
মুক্তি, পাশ্চা- সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে
তের ধর্ম ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ
খোঁজাচ্ছে, সুখের জ্ঞান খাটাচ্ছে।

মোক্ষ কি? যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও
গোলামী, পরলোকেরও তাই। এই প্রকৃতির নিয়মের
বাইরে ত এ-লোকও নয়, পরলোকও নয়, তবে,
সে দাসহ—লোহার শিকল আর সোনার শিকল। তার-
পর প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল সে সুখ থাক্বে
না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে
যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসহ
হলে চলবে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে,
অন্যত্র নাই। এইজ্ঞ, ঐ যে কথা শুনেছ যে, মুক্ত-
পুরুষ ভারতেই আছে, অন্যত্র নেই, তা ঠিক। তবে,
পরে অন্যত্রও হবে। সে ত আনন্দের বিষয়। এককালে
এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল।
তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে
সঙ্গে ব্যাস শুক জনকাদিও বর্তমান ছিলেন। বৌদ্ধ-
দের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

মোক্ষমার্গই প্রধান হল। তাই অগ্নিপুরাণে রূপকচ্ছলে বলেছে যে, গয়াম্বর (বুদ্ধ) * সকলকে মোক্ষমার্গ দেখিয়ে জগৎ ধ্বংস করবার উপক্রম করেছিলেন, তাই দেবতারা এসে ছল করে তাঁকে চিরদিনের ধর্মলোপে ভারতের মত শাস্ত করেছিলেন। ফল কথা, এই অবনতি যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুদ্ধ ওটা ঐ ধর্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে, খামকা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এদিক না ওদিক। যখন বৌদ্ধরাজ্যে, এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, কুশান, মুসলমান, জৈন,

* গয়াম্বর ও বুদ্ধদেবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর মত পরে পরিবর্তিত হয়। তিনি দেহত্যাগের অন্তদিন পূর্বে কাশীধাম হইতে তখনক শিষ্যকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে একস্থানে বলিয়াছেন :—

“অগ্নিপুরাণে গয়াম্বর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহাতে (যেমন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত) বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, উহা কেবল পূর্ব হইতে প্রচলিত একটি উপাখ্যান মাত্র।

“বুদ্ধ যে গয়ানীর্ধ পর্বতে বাস করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ স্থান পূর্ব হইতেই ছিল, প্রমাণিত হইতেছে।”

[উদ্ধোধন—৮ম বর্ষ, ৫৮৮ পৃঃ]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ওদের একটা ভ্রম যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল ; জাতি, ব্যক্তি প্রকৃতিভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা, জোর করে এক করতে গেলে কি হবে ? বৌদ্ধরা বললে, ‘মোক্ষের মত আর কি আছে, ছুনিয়া-শুদ্ধ মুক্তি নেবে চল’—বলি, তা কখন হয় ? ‘তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর,’ এ কথা বলছেন হিন্দুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে। কাজের কথা ? ছোটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, ছোটো লোকের সঙ্গে এক বুদ্ধি হয়ে, একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না,—মোক্ষ নিতে দৌড়াচ্ছ ! হিন্দুশাস্ত্র বলছেন ‘যে ‘ধর্মের’ চেয়ে ‘মোক্ষটা’ অবশ্য অনেক বড়,—কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি ! অহিংসা ঠিক, ‘নিবৈর’ বড় কথা ; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। ‘আততায়িনমায়ান্ত’ * ইত্যাদি, হত্যা করতে এসেছে—

* গুরুং বা বালবধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রতম্ ।

আততায়িনমায়ান্তং হস্তাদেবাবিচারয়ন্ ॥ ম—৮।৩৫০

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই, মনু বলছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বশুন্ধরা—বীৰ্য্য-প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে, ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য সত্য, পরমসত্য,—স্বধর্ম কর হে বাপু! অশ্রায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু, অশ্রায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে, অর্থোপার্জন করে, স্ত্রী-পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার ‘মোক্ষ’!!

পূর্বে বলেছি যে, ‘ধর্ম’ হচ্ছে কার্যমূলক।

ধার্মিকের লক্ষণ হচ্ছে, সদা কার্যশীলতা।

ধর্ম-মুঠানে
চিন্তাভাবনা

এমন কি, অনেক মীমাংসকের মতে

বেদে যে স্থলে কার্য করতে বলছে না,

আততায়ী কে—

অগ্নিদো গরদশৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ ।

ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়্ভেতে আততায়িনঃ ॥ শুক্রনীতি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সে স্থানগুলি বেদই নয়।—‘আম্নায়ন্ত ক্রিয়ার্থহাং
আনর্থক্যং অতদর্থানাং’—জৈমিনিমুত্র । ১।২।১—‘ওঁকার
ধ্যানে সর্বার্থসিদ্ধি,’ ‘হরিনামে সর্ব পাপনাশ,’ ‘শরণা-
গতের সর্বাণ্ডি, এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য
সত্য ; কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে, লাখো লোক ওঁকার জপে
মচ্ছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত ‘প্রভু
যা করেন’ বলছে, এবং পাচ্ছে,—ঘোড়ার ডিম । তার
মানে বুঝতে হবে যে, কার জপ যথার্থ হয় ? কার
মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ ? কে শরণ যথার্থ নিতে
পারে ? যার কৰ্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ
যে ‘ধার্মিক’ ।

প্রত্যেক জীব শক্তি প্রকাশের এক একটি কেন্দ্র ।
পূর্বের কৰ্মফলে সে শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে, আমরা
তাই নিয়ে জন্মেছি । যতক্ষণ সে শক্তি কার্যরূপে
প্রকাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ কে স্থির থাকবে বল ?
ততক্ষণ, ভোগ কে ঘোচায় বল ? তবে দুঃখভোগের
চেয়ে, সুখভোগটা ভাল নয় ? কুর্শ্মের চেয়ে সুকর্শ্মটা
ভাল নয় ? পূজ্যপাদ শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন,—‘ভাল
মন্দ দুটো কথা, ভালটা তার করাই ভাল ।’

এখন ভালটা কি ? ‘মুক্তিকামের ভাল’ অগ্নিরূপ,
‘ধর্মকামের ভাল’ আর একপ্রকার । এই গীতাপ্রকাশক

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

শ্রীভগবান এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহাসত্যের উপর হিঁদ্র স্বধর্ম জাতিধর্ম ইত্যাদি।

মুক্তিকাম ও
ধর্মকামের
আদর্শের
বিস্তারিত

‘অদ্বৈতা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ’

—গী, ১২।১৩—ইত্যাদি ভগবদ্ভাক্য মোক্ষ-

কামের জন্ত। আর, ‘ক্লেব্যং মান্স গমঃ

পাথ’—গী, ২।৩—ইত্যাদি, ‘তস্মাদ্ভুক্তিষ্ঠ যশোলভস্ব’—

গী, ১।১৩৩—ইত্যাদি, ধর্মলাভের উপায়, ভগবান

দেখিয়েছেন! অবশ্য কর্ম করতে গেলেই, কিছু না

কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা; উপোসের চেয়ে

আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের

চেয়ে ভালমন্দমিশ্র-কর্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা

কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই

থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা

কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সর্বপ্রাধান্য

অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়,

রজঃপ্রাধান্যে ভালমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার

নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে, এই সর্বপ্রধান

হয়েছে, কি তমঃপ্রধান হয়েছে, কি করে বুঝি বল।

সুখঃখের-পার ক্রিয়াহীন শাস্ত্ররূপ সর্ব অবস্থায়

আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে

ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চূপ করে ধীরে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ধীরে পড়ে যাচ্ছি, এ কথাই জবাব দাও,—নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়,—‘ফলেন পরিচীযতে’। সত্ত্বপ্রাধান্তে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ই মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শাস্তি মহাবীর্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মত হাত-পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ, সর্বলোকপূজ্য; তাঁকে কি আর ‘পূজা কর’ বলে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয়? জগদম্বা তাঁর কপালফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে, এই মহাপুরুষকে সকলে পূজা কর, আর জগৎ অবনত মস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষই ‘অদ্বৈষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ’ ইত্যাদি। আর ঐ যে মিন্মিনে পিন্পিনে ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়াগাতা, সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত-চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয় ও পচা দুর্গন্ধ। অজ্জুন ঐ দলে পড়ছিলেন বলেই ত ভগবান্ এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, ‘ক্লেবং মান্স গমঃ পার্থ’—শেষ, ‘তস্মাস্বমূর্ত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব’। ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দলে পড়েছি—দেশগুরু পড়ে কতই ‘হরি’ বল্ছি, ভগবানকে ডাক্ছি, ভগবান শুনছেনই না, আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না,—তা ভগবান। এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্ভাক্য শোনা, ‘কৈব্যাং মাশ্ম গমঃ পার্থ’; তস্মাৎ-মুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব’।

এখন চলুক, পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের কথা। প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীদের ঠাকুর যীশু উপদেশ করছেন যে, নির্বৈর হও, একগালে চড়

মারলে আর এক গাল পেতে দাও, পাশ্চাত্য জাতি কৃষ্ণের প্রাচ্য জাতি যীশুর উপদেশ অনুসরণ করিতেছে কাজ-কর্ম বন্ধ কর, পৌটলা-পুঁটলী বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, ছুনিয়াটা, এই ছ চার দিনের মধ্যেই

নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য্য কর, শত্রু নাশ কর, ছুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু ‘উন্টা বুঝ্‌লি রাম’ হলো; ওরা ইউরোপীরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্লে না। সদা মহারজোগুণ, মহাকার্য্যশীল, মহা উৎসাহে দেশদেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর, আমরা কোণে বসে, পৌটলা-পুঁটলি বেঁধে, দিন-রাত, মরণের ভাবনা ভাব্ছি, ‘নলিনীদল-

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

গতজলমতি তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্’ * গাচ্ছি ;
 আর যমের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সঁধুচ্ছে।
 আর পোড়া যমও তাই বাগ্ পেয়েছে, ছুনিয়ার রোগ
 আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার উপদেশ শুনলে
 কে ? না—ইউরোপী। আর যীশুখৃষ্টের ইচ্ছার আয়
 কাজ করছে কে ? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা !! একথাটা
 বুঝতে হবে। মোক্ষমার্গ ত প্রথম বেদই উপদেশ
 করেছেন। তারপর বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব
 ঐখান থেকেই ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন
 সন্ন্যাসী,—অদেষ্ঠা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ—বেশ
 কথা, উত্তম কথা। তবে, জোর করে ছুনিয়াশুদ্ধকে ঐ
 মোক্ষ-মার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন ? ঘসে-মেজে রূপ,
 আর ধরে-বেঁধে পিরীত কি হয় ?^১ যে মানুষটা মোক্ষ চায়
 না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ
 করেছেন বল, ‘হয় মক্ষ, নয় তুমি উৎসন্ন যাও’, এ ছই
 কথা ! মোক্ষ ছাড়া যা কিছু চেষ্টা করবে, সে আটঘাট
 তোমার বন্ধ। তুমি যে এ ছুনিয়াটা একটু ভোগ করবে
 তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতিপদে বাধা। কেবল
 বৈদিক ধর্মে এই চতুর্বর্গ সাধনের উপায় আছে ধর্ম,
 অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ ;

* শঙ্কর-কৃত ‘মোহমুক্তার’। ৫

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ !!! তারপর ভাগ্যফলে ইউরোপীগুলো প্রটেস্ট্যান্ট (protestant) হয়ে, যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে ; হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর রামানুজ চতুর্বার্গের সমন্বয়রূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্তন করলেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষে ৩০ কোর লোক, দেরী হচ্ছে। ৩০ কোর লোককে চেতানো কি এক দিনে হয় ?

বৌদ্ধধর্মের আর বৈদিক-ধর্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত ত আমাদের এ সর্বনাশ কেন হল ? ‘কালেতে হয়’ বললে কি চলে ? কাল কি কার্যাকারণসম্বন্ধ ছেড়ে, কাজ করতে পারে ?

অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও উপায়হীনতায় বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে। বৌদ্ধবন্ধুরা চটে যাও, যাবে ; ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। সত্যটা বলা উচিত। উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়,—‘জ্ঞাতিধর্ম’, ‘স্বধর্ম’, যেটি বৈদিক ধর্মের, বৈদিক-সমাজের ভিত্তি। আবার, অনেক বন্ধুকে চটালুম, অনেক বন্ধু বলছেন যে, এ দেশের লোকের খোসামুদি হচ্ছে। একটা কথা

তাদের জন্ত বলে রাখা যে, দেশের লোককে খোসামোদ করে আমার লাভটা কি? না খেতে পেয়ে মরে গেলে দেশের লোকে একমুঠা অন্ন দেয় না; ভিক্ষে শিক্কে করে, বাইরে থেকে এনে, হুভিক্ষগ্রস্ত অনাথকে যদি খাওয়াই, ত তার ভাগ নেবার জন্ত দেশের লোকের বিশেষ চেষ্টা, যদি না পায়, ত গালাগালির চোটে অস্থির !! হে স্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলি! এই ত আমার

দেশের লোক, তাদের আবার কি খোসা-
 বর্ধ-রক্ষাই মোদ? তবে তারা উন্মাদ হয়েছে,
 জাতীয় কল্যা- নের উপায় উন্মাদকে যে ঔষধ খাওয়াতে যাবে,
 তার হাতে দু-দশটা কামড় অবশ্যই উন্মাদ দেবে;
 তা সয়ে যে ঔষধ খাওয়াতে যায় সেই যথার্থ বন্ধু।
 এই ‘জাতিধর্ম,’ ‘স্বধর্ম’ই সকল দেশে সামাজিক
 কল্যাণের উপায়, মুক্তির সোপান। ঐ ‘জাতিধর্ম’
 ‘স্বধর্ম’ নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে।
 তবে নিধুরাম-সিধুরাম যা জাতিধর্ম, স্বধর্ম বলে
 বুঝছেন, ওটা উল্টো উৎপাত; নিধু জাতিধর্মের
 ঘোড়ার ডিম বুঝছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন
 আচার বলে ধারণা কচ্ছেন, নিজের কোলে ঝোল
 টানছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন। আমি গুণগত জাতির
 কথা বলছি না, বংশগত জাতির কথা বলছি, জন্মগত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

জাতির কথা বলছি। গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি ; কিন্তু, গুণ ছ-চার পুরুষে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। সেই আসল জায়গায় ঘা পড়েছে, নইলে সর্বনাশ হল কেন ? ‘সঙ্করস্ত চ কৰ্ত্তা স্ত্রামুপহত্য়ামিমাঃ প্রজাঃ।’* কেমন করে এ ঘোর বর্ণসাক্ষর্য উপস্থিত হল, সাদা রং কাল কেন হল, সত্ত্বগুণ রজোগুণ প্রধান—তমোগুণে কেন উপস্থিত হল, সে সব অনেক কথা, বারাস্তরে বলবার রইল। আপাততঃ এইটি বোঝ যে, জাতিধর্ম যদি ঠিক ঠিক থাকে, ত সে দেশের অধঃপতন হবেই না। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমাদের অধঃপতন কেন হল ? অবশ্যই জাতিধর্ম উৎসর্গে গেছে। অতএব যাকে তোমরা জাতিধর্ম বলছ সেটা, ঠিক উল্টো। প্রথম, পুরাণ পুঁথি-পাটা বেশ করে পড়গে, এখনিই দেখতে পাবে যে, শাস্ত্রে যাকে জাতিধর্ম বলছে, তা সর্বত্রই প্রায় লোপ হয়েছে। তারপর, কিসে সেইটি ফের আসে, তারি চেষ্টা কর ; তা হলেই পরম কল্যাণ নিশ্চিত। আমি যা শিখেছি যা বুঝেছি, তাই তোমাদের বলছি ; আমি ত আর বিদেশ থেকে তোমাদের হিতের জন্য আমদানী হই নি যে, তোমাদের আহাম্মকিগুলিকে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে

* গীতা ৩।২৪

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

হবে ? বিদেশী বন্ধুর কি ? 'বাহবা' লাভ হলেই হল ।
তোমাদের মুখে চূণকালী পড়লে যে আমার মুখে
পড়ে,—তার কি ?

পূর্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয়
উদ্দেশ্য আছে । প্রাকৃতিক, নিয়মাধীনে বা মহা-
পুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক
রীতি-নীতি, সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী
হয়ে গড়ে যাচ্ছে । প্রত্যেক জাতির
জাতীয় জীবনের
মূল ভিত্তিতে জীবনের ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী
আঘাত পড়ি- উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত
লেই বিপ্লব বা রীতি-নীতিগুলির বাড়ার-ভাগ । এই বাড়ার
জাতীয় যুগে রীতি-নীতিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বড়
অবগতাবা ভাগ রীতি-নীতিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বড়
বেশী এসে যায় না ; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে
ঘা পড়ে, তখন সে জাতির নাশ হয়ে যাবে ।

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছ যে, রাক্ষসীর প্রাণ একটা
পাখীর মধ্যে ছিল । সে পাখীটার নাশ না হলে, রাক্ষসীর
কিছুতেই নাশ হয় না ; এও তাই । আবার দেখবে যে,
যে অধিকারগুলো জাতীয় জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক
নয়, সে অধিকারগুলো সব যাক না, সে জাতি বড় তাতে
আপত্তি করে না , কিন্তু, যখন যথার্থ জাতীয় জীবনে ঘা
পড়ে, তৎক্ষণাৎ মহাবলে প্রতিঘাত করে ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

তিনটি বর্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস
ফরাসী, ইংরাজ তোমরা অল্পবিস্তর জান—ফরাসী, ইংরেজ,
ও হিন্দুর দৃষ্টান্ত হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী
সমর্থন জাতি-চরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সব
অত্যাচার অবাধে সয়, করভারে পিষে দাও, কথা
নেই; দেশশুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই
কর, আপত্তি নেই; কিন্তু যেই সে স্বাধীনতার উপর
হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ
প্রতিঘাত করবে। কেউ কারুর উপর চেপে বসে
হুকুম চালাতে পাবে না, এইটিই ফরাসী চরিত্রের
মূলমন্ত্র। ‘জ্ঞানী মুখ’ ধনী দরিদ্র উচ্চ-বংশ নীচ-বংশ
রাজ্য-শাসনে সামাজিক-স্বাধীনতায় আমাদের সমান
অধিকার।’ এর ওপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে
ভূগতে হয়।

ইংরাজ-চরিত্রে ব্যবসা-বুদ্ধি আদান-প্রদান প্রধান ;
যথাভাগ শ্রায়বিভাগ, ইংরাজের আসল কথা। রাজা,
কুলীনজাতি-অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার
করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয়,
ত তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা—মাগ্ন
করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও ত তার-কার্য-কারণ
হিসাব-পত্রে আমি ছ কথ্য বলব বুঝ, তবে দেব।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন ; রাজাকে মেরে ফেললে ।

হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা, বেশ কথা । কিন্তু আসল জিনিষ হচ্ছে পার-মার্থিক স্বাধীনতা—‘মুক্তি’ । এইটাই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য ; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল, সব ঐখানে এক মত । ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্বনাশ ; তা ছাড়া যা কর, চুপ করে আছি । লাধি মার, ‘কাল’ বল, সর্বস্ব কেড়ে নাও—বড় এসে যাচ্ছে না ; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ । এই দেখ, বর্তমানকালে পাঠান বংশরা আসছিল-যাচ্ছিল কেউ সুস্থির হয়ে রাজ্য করতে পাচ্ছিল না ; কেন না ঐ হিঁদুর ধর্ম্মে ক্রমাগত আঘাত কচ্ছিল । আর মোগল-রাজ্য কেমন সুদৃঢ়-প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল ।—কেন ? না, মোগলরা ঐ জায়গাটায় ঘা দেয় নি । হিঁদুরাই ত মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি—জাহাঙ্গীর, সাজাহান, দারাসেকো, এদের সকলের মা যে হিঁদু । আর দেখ, যেই পোড়া আরক্তজীব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অমনি এত বড় মোগলরাজ্য স্বপ্নের স্থায় উড়ে গেল । ঐ যে ইংরেজের সুদৃঢ় সিংহাসন, এ কিসের উপর ? ঐ ধর্ম্মে হাত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

কিছুতেই দেয় না বলে। পাদরী-পুস্তকেরা একটু-আধটু চেষ্টা করেই ত,' ৫৭ সালের হাঙ্গামা উপস্থিত করেছিল। ইংরাজেরা যতক্ষণ এইটি বেশ করে বুঝবে এবং পালন করবে, ততক্ষণ ওদের 'তকত তাজ অচল রাজধানী'। বিজ্ঞ বহুদর্শী ইংরাজেরাও একথা বোঝে, লর্ড রবার্টসের 'ভারতবর্ষে ৪১ বৎসর' নামক পুস্তক পড়ে দেখ।*

এখন বুঝতে পারছ ত, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায়?—ধর্ম্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারে নি বলেই, জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে। আচ্ছা, একজন দেশী পণ্ডিত বলছেন যে, ওখানটায় প্রাণটা রাখবার এত আবশ্যক কি? সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় রাখ না কেন?—যেমন অগ্ন্যাগ্ন অনেক দেশে। কথাটি ত হল সোজা, যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব মিথ্যা, তা হলেও কি দাঁড়ায়, দেখ। অগ্নি ত এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিন্দুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু, এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দী কতক নানা সুখ-দুখের ভেতর দিয়ে, ফরাসী বা ইংরেজ-চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারি প্রেরণায় লক্ষ

* Forty-one Years in India—৩০ ও ৩১ অধ্যায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

শতাব্দীর আবর্তনে হিঁহুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা, না তোমার বিদেশীয় ছু পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা? ইংরেজ কেন ধর্মপ্রাণ হক না, মারামারি কাটাকাটিগুলো ভুলে শাস্ত-শিষ্টটি হয়ে বসুক না?

আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ফ্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে, ত ইদিক-উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন করে হক, সমুদ্রে যাবেই, ছু দিন আগে বা পরে, ছুটো ভাল জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় ছ-একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে ত আর ত এখন উপায় নেই, এখন একটা নূতন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই ত নয়।

কিন্তু এ বুদ্ধিটি আগা-পাস্তলা ভুল, মাপ করো অল্পদর্শীর কথা। দেশে দেশে আগে যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তারপর যদি মাথা থাকে ত ঘামাও তার উপর নিজেদের পুরাণ পুঁথি-পাটা পড়, ভারতবর্ষের

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দেশদেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান-পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চক্ষে নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক্-ধক্ করছে, ওপরে ছাই-ছাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এ দেশের প্রাণ—ধর্ম, ভাষা—ধর্ম, ভাব—ধর্ম ;—আর তোমার রাজ-নীতি, সমাজনীতি, রাস্তাবোর্টান, প্লেগ-নিবারণ, জুভিস্ক-গ্রন্থকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় ত হবে ; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চোঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র !

তা ছাড়া উপায় ত সব দেশেই সেই এক, অর্থাৎ বাকিগুলো খালি ‘ভেড়িয়াধসান’ * বই ত নয়। ও তোমার ‘পার্লেমেন্ট, দেখলুম’, ‘সেনেট্’ দেখলুম, ভোট্, ব্যালট্, মেজরিটি, সব দেখলুম, রামচন্দ্র !

শক্তিমান সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান
পুরুষই সকল পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে, সমাজকে
সমাজের চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল। তবে
পরিচালক ভারতবর্ষে শক্তিমান পুরুষ কে? না,
ধর্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তাঁরাই

* জায়শান্নে যাহাকে ‘গড্ডলিকা প্রবাহ’ বলে। যেমন একটি মেঘের অল্পকরণে অপর মেঘসমূহ তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সমাজের রীতি-নীতি বদলাবার দরকার হলে বদলে দেন। আমরা চুপ করে শুনি, আর করি। তবে এতে তোমার বাড়ার-ভাগ, ঐ মেজরিটি, ভোট প্রভৃতি হাঙ্গামগুলো নেই, এই মাত্র।

অবশ্য ভোট ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না, কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা-নামে দিনে তাজা হচ্ছে সে দলও আমাদের দেশে নেই। সে ঘূষের ধুম, সে দিনে-ডাকাতি

যা পাশ্চাত্যদেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে ত মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে। ‘গল্লী গল্লী গোরস ফিরে মদিরা বৈঠি বিকায়। সতীকো ধোতী না মিলে কসবিন্ পহিনে খাসা।’ * যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুটোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষ্ক, তারপর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে,—জিত হলে, তাঁদের ঘরভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো ত সেই-

* ‘গলিতে গলিতে দুগ্ধ ফেরি করিতে হয়, কিন্তু সুরা এক-স্থানে বসিয়াই বিক্রয় হয়। সতী-নারীর পরিধানের বস্ত্র জুটে না, অসতী স্নবেশ পরিধান করে। ধন্য কলিযুগের প্রভাব!’

—মহাত্মা তুলসীদাস

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

খানেকই মারা গেল,—হে রাম! চমকে যেও না, ভাঁওতায় ভুলো না।

একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকায় মানুষ করতে পারে? মানুষে নাম-যশ করে, না নাম-যশে মানুষ করে?

মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ওসব বাকি আপনা-আপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুন্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে সহৃদেশে সহুপায় সংসাহস সঙ্ঘীর্ষ্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ ত একটা মানুষ হও

দাগ রেখে যাও। ‘তুলসী আয়ো জগৎমে, জগৎ হঁসে তুম্ রোয়। এ্যায়সী করনী কর্ চলো, আপ হঁসে জগ রোয়॥’ যখন তুমি জন্মেছিলে তুলসী, সকলে হাস্তে লাগলো, তুমি কাঁদতে লাগলে; এখন এমন কাজ করে চল যে, তুমি হাস্তে হাস্তে মরবে, আর জগৎ তোমার জন্ত কাঁদবে। এ পার, তবে তুমি মানুষ, নইলে কিসের তুমি?

আর এক কথা বোঝ দাদা,—অবশ্য আমাদের অগ্ন্যাগ্ন জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটে বলে, আমরা সবজ্ঞান্তা, সে জাতের

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

অবনতির দিন অতি নিকট ! ‘যতদিন বাঁচি, ততদিন
শিখি !’ তবে দেখ, জিনিষটে আমাদের

পাশ্চাত্য

জাতির গুণ-

সকল আমাদের

হাঁচে ফেলিয়া

নইতে হইবে

ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র। আর

আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে, বাকি জিনিষ

শিখতে হবে। বলি, খাওয়া ত সব দেশেই

এক ; তবে, আমরা পা গুটিয়ে বসে

খাই, বিলাতিরা পা ঝুলিয়ে বসে খায়। এখন মনে

কর যে, আমি এদের রকমে রান্না-খাওয়া খাচ্ছি ; তা বলে

কি এদের মত ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাকতে হবে ? আমার

ঠ্যাং যে যমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে—টনটনানিতে

যে প্রাণ যায়, তার কি ? কাজেই পা গুটিয়ে এদের

খাওয়া খাব বৈকি। ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে

হবে, সেটা আমাদের মত করে—পা গুটিয়ে, আসল

জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে। বলি, কাপড়ে কি

মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে ? শক্তিমান পুরুষ

যে পোষাকই পরুক না কেন, লোকে মানে ; আর,

আমার মত আহাম্মক ধোপার বস্ত্র ঘাড়ে করে বেড়ালেও

লোকে গ্রাহ করে না।

এখন, গৌরচন্দ্রিকাটা বড্ড বড় হয়ে পড়ল ; তবে

হৃদে তুলনা করা সোজা হবে, এই ভণিতার পর।

এরাও ভাল,—আমরাও ভাল, ‘কাকো নিন্দো, কাকো

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বন্দো, ছ'য়ো পল্লা ভারি।' তবে ভালর রকমারি আছে, এইমাত্র।

মানুষের মধ্যে আছেন, আমাদের মতে তিনটে জিনিষ। শরীর আছেন, মন আছেন, আত্মা আছেন। প্রথম শরীরের কথা দেখা যাক, সকলকার চেয়ে বাইরের জিনিষ।

শরীরে শরীরে কত ভেদ, প্রথমে দেখ। নাক, মুখ, গড়ন, লম্বাই-চৌড়াই, রঙ, চুল, কত রকমের তফাৎ।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রঙের তফাৎ বর্ণসাক্ষর্যে উপস্থিত হয়। গরম দেশ, ঠাণ্ডা দেশ ভেদে, কিছু পরিবর্তন অবশ্য হয়; কিন্তু কাল-সাদার-বর্ণভেদের কারণ আসল কারণ, পৈতৃক। অতি শীতল দেশেও ময়লা রঙ, জাতি দেখা যাচ্ছে, অতি উষ্ণ দেশেও ধপ্পে ফরসা জাতি বাস করছে। কানাডানিবাসী আমেরিকার আদিম-মানুষ ও উত্তর-মেরুসন্নিহিত দেশনিবাসী এস্কুইমো প্রভৃতির খুব ময়লারঙ, আবার মহাবিশুবরেখার উপরিস্থিত দ্বীপেও সাদারঙ আদিম জাতির বাস; বোর্নিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ইহার নিদর্শন।

এখন আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, হি'হর ভেতর

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাত এবং চীন, হুন, দরদ্, পহ্লব, যবন এবং খশ, এই সকল
আর্যজাতি ভারতের বহিঃস্থিত জাতি, এঁরা হচ্ছেন
আর্য্য। শাস্ত্রোক্ত চীন জাতি, এ বর্তমান ‘চীনেম্যান’
নয়; ওরা ত সে-কালে নিজেদের ‘চীনে’ বলতই না।
‘চীন’ বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তর-পূর্বভাগে
ছিল; দরদ্রাও যেখানে এখন ভারত আর আফগানি-
স্থানের মধ্যে পাহাড়ি জাত সকল, ঐখানে ছিল।
প্রাচীন চীন জাতির ছু দশটা বংশধর এখনও আছে।
দরদিস্থান এখনও বিদ্যমান। ‘রাজতরঙ্গিনী’ নামক
কাশ্মীরের ইতিহাসে বারম্বার দরদ্রাজের প্রভুতার
পরিচয় পাওয়া যায়। হুন নামক প্রাচীন জাতি অনেক
দিন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল।
এখন টিবেটিরা নিজেদের হুন বলে; কিন্তু সেটা বোধ
হয় ‘হিউন’। ফল মনুস্ত হুন আধুনিক তিব্বতী ত নয়;
তবে এমন হতে পারে যে সেই আর্য্য হুন এবং
মধ্যআশিয়া হতে সমাগত কোন মোগ্লাই জাতির
সংশ্লিষ্টে বর্তমান তিব্বতীর উৎপত্তি। প্রজাবলঙ্কি এবং
ডুাক্‌ড অর্লিআঁ নামক রুশ ও ফরাসী পর্য্যটকদের
মতে তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আর্য্য-মুখচোখ-
বিশিষ্ট জাতি দেখতে পাওয়া যায়। যবন হচ্ছে গ্রীক-

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দের নাম। এই নামটার ওপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। অনেকের মতে, যবন এই নামটা ‘য়োনিয়া’ (Ionia) নামক স্থানবাসী গ্রীকদের ওপর প্রথম ব্যবহার হয় ; এজ্ঞা মহারাজ অশোকের লেখমালায় ‘যোন’ নামে গ্রীকজাতি অভিহিত। পরে ‘যোন’ হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দেশীয় কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে ‘যবন’ শব্দ গ্রীকবাণী নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল। ‘যবন’ শব্দই আদি শব্দ, কারণ শুধু যে হিঁদ্রাই গ্রীকদের যবন বলত, তা নয় ; প্রাচীন মিশরী ও ব্যাবিলোঁরাও গ্রীকদের যবন নামে আখ্যাত করত। ‘পহ্লব’ শব্দে, পেহলবি ভাষাবাদী প্রাচীন পারসী জাতি। ‘খশ্’ শব্দে এখনও অন্ধসভা পার্শ্বত্যাদেশবাসী আৰ্য্যজাতি, এখনও হিমালয়ে ঐ নাম ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্তমান ইউরোপীরাও এই অর্থে খশ্দের বংশধর। অর্থাৎ যে সকল আৰ্য্য-জাতিরা প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ্।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আৰ্য্যদের লালচে সাদা রঙ, কাল বা লাল চুল, সোজা নাক-চোখ ইত্যাদি ;
এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ-ভেদে, একটু
আৰ্য্যজাতির
গঠন ও বর্ণ তফাৎ। যেখানে রঙ কাল, সেখানে
অগ্ন্যগ্ন কাল জাতির সঙ্গে মিশে এইটি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দাঁড়িয়েছে। এদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত ছ-চার জাতি এখনও পুরো আর্য্য আছে, বাকি সমস্ত খিচুড়িজাত, নইলে কাল কেন হল? কিন্তু ইউরোপী পণ্ডিতদের এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশুর লালচুল জন্মায়, কিন্তু ছচার বৎসরেই চুল ফের কাল হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেকের লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।

এখন পণ্ডিতেরা লড়ে মরুন! ‘আর্য্য’ নাম হিঁদুরাই নিজেদের ওপর চিরকাল ব্যবহার করেছে। শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হিঁদুরের নাম আর্য্য, হিন্দু ও আর্য্য বস্। কাল বলে ঘৃণা হয়, ইউরোপীরা অশ্রু নাম নিন্গে। আমাদের তায় কি?

কিন্তু কাল হোক, গোরা হোক, ছনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হিঁদুর জাত সুশ্রী সুন্দর। প্রাচ্য ও পাশ্চা- একথা আমি নিজের জাতের বড়াই করে ত্তের মোটা- বলছি না, কিন্তু একথা জগৎপ্রসিদ্ধ। যুট প্রভেদ শতকরা সুশ্রী নরনারীর সংখ্যা এদেশের মত আর কোথায়? তার ওপর ভেবে দেখ, অশ্রাশ্র দেশে সুশ্রী হতে যা লাগে, আমাদের দেশে তার চেয়ে ঢের বেশী; কেন না, আমাদের শরীর অধিকাংশই খোলা। অশ্র দেশে কাপড়-চোপড় ঢেকে, বিস্ত্রীকে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ক্রমাগত স্মৃত্তী করবার চেষ্টা। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক সুখী। এ সব

১। হিন্দু হুজ্জি দেশে ৪০ বৎসরের পুরুষকে জোয়ান
ইউরোপীয় বলে, ছোঁড়া বলে, ৫০ বৎসরের জ্বীলোক
হুকায় যুবতী। অবশ্য এরা ভাল খায়, ভাল
পরে, দেশ ভাল এবং সর্বাপেক্ষা আসল কথা হচ্ছে,
অল্প বয়সে বে করে না। আমাদের দেশেও যে ছ-
একটা বলবান জাতি আছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করে
দেখ, কত বয়সে বে করে। গোরখা, পাঞ্জাবী, জাঠ,
আফ্রিদি প্রভৃতি পার্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর। তারপর
শাস্ত্র পড়ে দেখ,—৩০, ২৫, ২০,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের
বের বয়স। আয়ু, বল, বীৰ্য্য, এদের আর আমাদের,
অনেক ভেদ; আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা,—তিন
পেরুলেই ফরসা; এরা তখন সবে গা ছেড়ে উঠছে।
আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে;
উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এরা মাংসাশী, এদের
অধিক রোগই বুকে। হৃদ্রোগে, ফুস্ফুস রোগে এদের
বুড়োবুড়ী মরে। একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু
জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা কি
প্রায় নিরুৎসাহ বৈরাগ্যবান হয়? হৃদয়াদি ওপরের
শরীরের রোগে, আশা বিশ্বাস পুরো থাকে। ওলাওঠা-

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

রোগী গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারোগী
২। আমাদের মরবার সময় পর্য্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে,
মৃত্যু অধিকাংশ সে সেরে উঠবে। অতএব সেই জন্তেই
উদররোগে, কি, ভারতের লোক সর্বদাই মরণ-মরণ
উহাদের আর বৈরাগ্য-বৈরাগ্য করছে? আমি ত
জ্ঞানোপে এখনও উত্তর দিতে পারি নাই; কিন্তু
কথাটা ভাববার বটে। আমাদের দেশে দাঁতের
রোগ চুলের রোগ, খুব কম। এ সব দেশে
অতি অল্প লোকেরই নিজের স্বাভাবিক দাঁত।
আর টাকের ছড়াছড়ি। আমরা নাক ফুঁড়ছি, কাণ
ফুঁড়ছি গহনা পরবার জন্ত। এরা এখন, ভদ্রলোকে,
বড় নাক-কাণ ফোঁড়ে না; কিন্তু কোমর বেঁধেবেঁধে,
শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে, পিলে যত্নকে স্থানভ্রষ্ট করে
শরীরটাকে বিক্রী করে বসে। ‘গড়ন গড়ন’ করে এরা
মরে, তায় ঐ বস্তাবন্দি কাপড়ের উপর গড়ন রাখতে
হবে। এদের পোষাক—কাজকর্ম করবার অত্যন্ত
উপযোগী; ধনীলোকের স্ত্রীদের সামাজিক পোষাক
ছাড়া, মেয়েদের পোষাকও হতচ্ছাড়া। আমাদের
মেয়েদের শাড়ী, আর পুরুষদের চোগা-চাপকান-
পাগড়ীর সৌন্দর্য্যের এ পৃথিবীতে তুলনা নেই।
ভাঁজ ভাঁজ পোষাকে যত রূপ, তত আঁটসাঁটায় হয় না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আমাদের পোষাক সমস্তই ভাঁজ ভাঁজ, আমাদের কাজ-
কর্মের পোষাক নেই; কাজ কর্তে গেলেই কাপড়-
চোপড় যায়। এদের ফ্যাসান্ কাপড়ে, আমাদের
ফ্যাসান্ গয়নায়; এখন কিছু কিছু কাপড়েও হচ্ছে।
ফ্যাসান্টা কি, না—টঙ; মেয়েদের কাপড়ের টঙ—

পারি সহর থেকে বেরোয়, পুরুষদের—
পোষাক
লগুন থেকে। আগে পারির নর্তকীরা
এই টঙ ফেরাত। একজন বিখ্যাত নটী যা পোষাক
পরলে, সকলে অম্মনি দৌড়ুল তাই কর্তে। এখন
দোকানীরা টঙ করে। কত ক্রোর টাকা যে, এই
পোষাক কর্তে লাগে প্রতি বৎসর, তা আমরা
বুঝে উঠতে পারি নি। এ পোষাক গড়া এক
প্রকাণ্ড বিত্তে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ মেয়ের গায়ের
চুলের রঙ্গের সঙ্গে, কোন্ রঙের কাপড় সাজস্ত
হবে; কার শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে,
কোনটা বা পরিস্ফুট করতে হবে, ইত্যাদি অনেক মাথা
ঘামিয়ে পোষাক তৈরী হয়। তারপর, ছ চার জন
উচ্চপদস্থ মহিলা যা করেন, বাকি সকলকে তাই পরতে
হয়,—না পরলে জাত যায়!! এর নাম ফ্যাসান্!
আর এই ফ্যাসান্ ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে; বছরে
চার ঋতুতে চার বার বদলাবেই ত, তা ছাড়া অগ্ন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সময়েও আছে। যারা বড় মানুষ, তারা দরজী দিয়ে পোষাক করিয়ে নেয়; যারা মধ্যবিৎ ভদ্রলোক, তারা কতক নিজের হাতে, কতক ছুটকো-ছাটকা মেয়ে-দরজী দিয়ে, নূতন ধরণের পোষাক গড়িয়ে নেয়। পরবর্তী ফ্যাসান যদি কাছাকাছি রকমের হয়, ত পুরাণ কাপড় বদলে সদলে নেয়, নতুবা নূতন কেনে। বড় মানুষরা ফি ঋতুতে কাপড়গুলি চাকর-বাকরদের দান করে। মধ্যবিত্তেরা বেচে ফেলে; তখন সে কাপড়গুলি ইয়োরোপীয় লোকদের যে সমস্ত উপনিবেশ আছে,—আফ্রিকা এসিয়া অষ্ট্রেলিয়ায়—সেথায় গিয়ে হাজির হয় এবং তারা পরে। যারা খুব ধনী, তাদের কাপড় পারি হতে তৈয়ার হয়ে আসে; বাকিরা নিজেদের দেশে সেগুলি নকল করে পরে! কিন্তু, মেয়েদের টুপিটি আসল ফরাসী হওয়া চাই-ই চাই। যার তা নয়, সে লেডি নয়। ইংরেজের মেয়েদের আর জার্মান মেয়েদের পোষাক বড় খারাপ; ওরা বড় পারিচণ্ডে পোষাক পরে না—তু দশজন বড় মানুষ ছাড়া; এই-জন্ত অত্যাশ্চর্য দেশের মেয়েরা ওদের ঠাট্টা করে। ইংরেজ পুরুষরা কিন্তু খুব ভাল পোষাক পরে,—অনেকেই। আমেরিকার মেয়ে-পুরুষ সকলেই খুব ঢঙসই পোষাক পরে। যদিও আমেরিক গবর্ণমেন্ট

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

পারি বা লণ্ডনের আমদানী পোষাকের উপর খুব মাশুল বসায়, যাতে বিদেশী মাল এ দেশে না আসে ; তথাপি এরা মাশুল দিয়েও, মেয়েরা পারি ও পুরুষরা লণ্ডনের তৈরী পোষাক পরে । নানা রকমের নানা রঙের পশমিনা, বনাত, রেশমী কাপড় রোজ রোজ বেরুচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাইতে লেগে আছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাই কেটে-ছেঁটে পোষাক করছে । ঠিক চণ্ডের পোষাক না হলে, জেন্টেলম্যান বা লেডীর রাস্তায় বেরুনই মুশ্কিল । আমাদের দেশে এ ফ্যাসানের হাজ্জাম কিছু কিছু গহনায় ঢুকছে । এ সব দেশের পশম-রেশম-তাঁতিদের নজর দিন রাত—কি বদলাচ্ছে বা না বদলাচ্ছে—লোকে কি রকম পছন্দ করছে—তার উপর, অথবা, নূতন একটা করে লোকের মন আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে । একবার আন্দাজ লেগে গেলেই, সে ব্যবসাদার বড়মানুষ । যখন তৃতীয় নেপলিওঁ ফরাসী দেশের বাদশা ছিলেন, তখন সম্রাজ্ঞী অজেনি পাশ্চাত্য-জগতের বেশভূষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী । তাঁর কাশ্মীরী শাল বড় পছন্দ ছিল । কাজেই লাখো টাকার শাল ইয়োরোপ প্রতি বৎসর কিনত । তাঁর পতন অবধি সে চণ্ড বদলে গেছে । শাল আর বিক্রী হয় না । আর আমাদের দেশের লোক দাগাই বুলায় ; নূতন একটা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

কিছু করে সময় মত, বাজার দখল কর্তে পাল্‌না ; কাশ্মীর বেজায় ধাক্কা খেলে ; বড় বড় সদাগর গরীব হয়ে গেল। এ সংসার—দেখ্‌ তোরা, না দেখ্‌ মোর, কেউ কি কারু জন্তু দাঁড়িয়ে আছে ? ওরা দশ চোখ, দুশ হাত দিয়ে দেখ্‌ছে খাটুছে ; আমরা—‘গৌসাইজী যা পুঁথিতে লেখেন নি—তা কখনই করবো না’ ; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা

হাহাকার ! দোষ কার ? প্রতিবিধানের

মৌলিকতা

অভাবেই আমরা- চেষ্টা ত অষ্টরস্তা ; খালি চীৎকার হচ্ছে !

দের অবনতি

বস্‌। কোণ থেকে বেরোও না—
 ছুনিয়াটা কি, চেয়ে দেখ না। আপনা-আপনি বুদ্ধি
 শুদ্ধি আসবে। দেবাসুরের গল্প ত জানই। দেবতার
 আস্তিক—আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে, পরলোকে বিশ্বাস
 রাখে। অসুররা বলছে—ইহলোক এই পৃথিবী ভোগ
 কর, এই শরীরটাকে সুখী কর। দেবতা ভাল, কি
 অসুর ভাল, সে কথা হচ্ছে না। বরং পুরাণের অসুর-
 গুলোই ত দেখি মনিষ্যের মত, দেবতাগুলো ত
 অনেকাংশে হীন। এখন যদি বোঝ যে তোমরা
 দেবতার বাচ্চা আর পাশ্চাত্যেরা অসুরবংশ তা হলেই,
 ছদ্দেশ বেশ বুঝতে পারবে।

দেখ, শরীর নিয়ে প্রথম। বাহ্যভাস্তুর শুদ্ধি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

হচ্ছে—পবিত্রতা। মাটি জল প্রভৃতির দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয়; উত্তম। হুনিয়ায় এমন জাত শরীর শুদ্ধ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা কোথাও নেই যাদের শরীর হিঁহুদের মত সাফ। হিঁহু ছাড়া আর কোনও জাত জলশৌচাদি করে না। তবু পাশ্চাত্যদের, চীনেরা কাগজ-ব্যবহার করাতে শিখিয়েছে—কিছু বাঁচোয়া। স্নানও নেই বললেই হয়। এখন ইংরেজরা ভারতে এসে স্নান-টুকিয়েছে দেশে। তবুও যে সব ছেলেরা বিলাতে পড়ে এসেছে তাদের জিজ্ঞাসা কর—যে স্নানের কি কষ্ট। যারা স্নান করে—সে সপ্তায় এক দিন—সে দিন ভেতরের কাপড় আগার-ওয়ার বদলায়। অবশ্য এখন পয়সা-ওয়ালাদের ভেতর অনেকে নিত্যস্নায়ী। আমেরিকরা একটু বেশী! জর্মান—কালেভদ্রে; ফরাসী প্রভৃতি কস্মিনকালেও না!!! স্পেন ইতালী অতি গরম দেশ, সে আরও নয়—রাশীকৃত লম্বুন খাওয়া দিন-রাত ঘর্মাক্ত, আর সাত জন্মে জলস্পর্শও না! সে গায়ের গন্ধে ভূতের চৌদ্দপুরুষ পালায়—ভূত ত ছেলেমানুষ। ‘স্নান’ মানে কি—মুখটি মাথাটি ধোয়া, হাত ধোয়া—যা বাহিরে দেখা যায়। আবার কি! পারি—সভ্যতার রাজধানী পারি, রঙ-চঙে ভোগবিলাসের ভূষর্গ পারি,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বিজ্ঞা-শিল্পের কেজ্জ পারি, সেই পারিতে এক বৎসর এক বড় ধনী-বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আনলেন। এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন—রাজভোগ খাওয়া-দাওয়া কিন্তু স্নানের নামটি নেই। ছুদিন ঠায় সহ্য করে—শেষে আর পারা গেল না। শেষে বন্ধুকে বলতে হলো—দাদা, তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমায় এখন ‘ছেড়ে দে মা, কেন্দে বাঁচি’ হয়েছে। এই দারুণ গরমীকাল, তাতে স্নান করবার জো নেই, হন্তে কুকুর হবার যোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু হুঃখিত হয়ে চটে বললেন, ‘এমন হোটেলে থাকা হবে না, চল ভাল জায়গা খুঁজে নিইগে।’ ১২টা প্রধান প্রধান হোটেলে খোঁজা হলো, স্নানের স্থান কোথাও নেই। আলাদা স্নানাগার সব আছে, সেখানে গিয়ে ৪।৫ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল হরি! সে দিন বিকালে কাগজে পড়া গেল—এক বুড়ী স্নান কর্তে টবের মধ্যে বসেছিল, সেইখানেই মারা পড়েছে !!! কাজেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ীর চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই বুপোকাৎ !!! এর একটি কথা অতিরঞ্জিত নয়। রুশ-ফুস্‌গুলো ত আসল স্লেচ্ছ, তিব্বৎ থেকেই ও ঢং আরম্ভ। আমেরিকায় অবশ্য প্রত্যেক বাসাবাড়ীতে একটা করে স্নানের ঘর ও জলের পাইপের বন্দোবস্ত আছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

কিন্তু তফাৎ দেখ আমরা স্নান করি কেন ?—
অধর্মের ভয়ে ; পাশ্চাত্যেরা হাত-মুখ ধোয়—পরিষ্কার
হবে বলে। আমাদের—জল ঢাললেই হল, তা
তেলই বেড়-বেড় করুক, আর ময়লাই লেগে থাকুক।
আবার, দক্ষিণী ভায়া স্নান করে এমন লম্বা চওড়া
তেলক কাটলেন যে, বামারও সাধ্য নয় তাকে ঘসে
তোলে। আবার আমাদের স্নান সোজা কথা, যেখানে
হক ডুব লাগালেই হল। ওদের সে এক-বস্তা কাপড়
খুলতে হবে, তার বন্ধনই বা কি ! আমাদের গা
দেখাতে লজ্জা নেই ; ওদের বেজায়। তবে পুরুষে
পুরুষে কিছুমাত্র নেই—বাপ বেটার সাম্নে উলঙ্গ
হবে—দোষ নেই। মেয়েছেলের সাম্নে আপাদমস্তক
ঢাকতে হবে।

‘বহিরাচার’, অর্থাৎ পরিষ্কার থাকটা, অগ্ন্যগ্ন্য
আচারের স্তায়, কখন কখন অত্যাচার বা অনাচার
হয়ে পড়ে। ইউরোপী বলে যে, শরীর সম্বন্ধী সমস্ত
কার্য্য অতি গোপনে করা উচিত। উত্তম কথা। এই
শৌচাদি ত দূরের কথা ; লোক-মধ্যে থু-থু ফেলা
একটা মহা অভদ্রতা। খেয়ে আচান সকলের সাম্নে,
অতি লজ্জার কথা, কেন না কুলকুচো তায় আছে।
লোকলজ্জার ভয়ে, খেয়ে-দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে ;

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

—ক্রমে দাঁতের সর্বনাশ হয়। সভ্যতার ভয়ে অনাচার। আমাদের আবার ছুনিয়ার লোকের সাম্নে, রাস্তায় বসে, বমির নকল কর্তে কর্তে মুখখোওয়া, দাঁত-মাজা আচান,—এটা অত্যাচার। সমস্ত কার্য গোপনে করা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও অনুচিত।

আবার দেশভেদে যে সকল কার্য অনিবার্য, সেগুলো সমাজ সযে নেয়! আমাদের গরমদেশে খেতে বসে আধ ঘড়াই জল খেয়ে ফেলি—এখন ঢেঁকুর না তুলে যাই কোথা; কিন্তু ঢেঁকুর তোলা পাশ্চাত্যদেশে অতি অভদ্রের কাজ। কিন্তু খেতে খেতে রুমাল বার করে দিব্যি নাক ঝাড়—তত দোষের নয়; আমাদের দেশে ঘৃণার কথা। এ ঠাণ্ডা দেশে মধ্যে মধ্যে নাক না ঝেড়ে থাকা যায় না।

ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচতে দিই। না ছুঁলেই হল। এদিকে যে নরককুণ্ডে বাস হচ্ছে, তার কি? একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার। একটা পাপ এড়াতে গিয়ে, আর একটা গুরুতর পাপ করছি। যার বাড়ীতে ময়লা, সে পাপী, তাতে আর সন্দেহ কি? তার

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সাজাও তাকে মরে পেতে হবে না,—অপেক্ষাও বড় বেশী কর্তে হবে না।

আমাদের রান্নার মত পরিষ্কার রান্না কোথাও নেই। বিলেতি খাওয়ার শৃঙ্খলার মত পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের নেই। আমাদের রাঁধুনী স্নান করেছে ; কাপড় বদলেছে ; হাঁড়িপত্র উম্মন সব ধুয়ে মেজে সাফ করেছে ; নাকে মুখে গায়ে হাত ঠেকলে, তখনি হাত ধুয়ে তবে আবার ঋতুদ্রব্যে হাত দিচ্ছে। বিলাতি রাঁধুনীর চোদ পুরুষে কেউ স্নান করে নি ; রাঁধতে রাঁধতে চাচ্ছে, আবার সেই চামুচে হাঁড়িতে ডোবাচ্ছে।

আহার সম্বন্ধে রুমাল বার করে কোঁৎ করে নাক ঝাড়লে,
প্রাচ্য ও আবার সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ
পাশ্চাত্য থেকে এল—কাগজ ব্যবহার করে সে হাত
আহারের ধোবার নামটিও নেই—সেই হাতে রাঁধতে
ভুলনা লাগলো। কিন্তু ধপ্-ধপে কাপড় আর টুপি পরেছে।
হয়ত, একটা মস্ত কাঠের টবের মধ্যে ছোটো মানুষ
উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রান্নাকৃত ময়দার উপর নাচছে—
কিনা ময়দা মাখা হচ্ছে। গরমী কাল—দরবিগলিত
ঘাম পা রেয়ে সেই ময়দায় সঁজুচ্ছে। তারপর তার
রুটি তৈয়ার যখন হল, তখন ছন্ধফেননিভ তোয়ালের
উপর চীনের বাসনে সজ্জিত হয়ে পরিষ্কার চাদর

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বিছানো টেবিলের উপর, পরিষ্কার কাপড়-পরা কনুই পর্য্যন্ত সাদা দস্তানা-পরা চাকর, এনে সামনে ধরলে ! কোনও জিনিষ হাত দিয়ে পাছে ছুঁতে হয়, তাই কনুই পর্য্যন্ত দস্তানা ।

আমাদের স্নান-করা বামুন, পরিষ্কার বাসনে পরিষ্কার হাঁড়িতে, শুদ্ধ হয়ে রেঁধে গোময়সিক্ত মাটির উপর খালিশুদ্ধ অন্ন-ব্যাঞ্জন ঝাড়লে ; বামুনের কাপড়ে খাম্ছে ময়লা উঠছে । হয়ত মাটি-ময়লা-গোবর আর ঝোল, কলাপাত ছেঁড়ার দরুন, একাকার হয়ে, এক অপূর্ব আশ্বাদ উপস্থিত করলে !!

আমরা দিব্য স্নান করে একখানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম, আর ইউরোপে, ময়লা গায়ে, না-নেয়ে একটি ধপ্পে পোষাক পরলে । এইটি বেশ করে বোঝ, এইটি আগা-গোড়ার তফাৎ—হিন্দুর সেই যে অস্তুদৃষ্টি তা আগা-পাস্তলা সমস্ত কাজে । হিঁহু—ছেঁড়া স্নাতা মুড়ে কহিনুর রাখে ; বিলাতি, সোনার বাজায় মাটির ডেলা রাখে ! হিঁহুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হক্ ! বিলাতির কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা ! হিঁহুর ঘর-দোর খুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরক-কুণ্ড থাকুক না কেন ! বিলাতির মেজে কারপেটে মোড়া ঝক্ঝকে,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হল !! হিঁদ্র পয়ঃনালী রাস্তার উপর—হুর্গন্ধে বড় এসে যায় না। বিলাতির পয়ঃনালী রাস্তার নীচে—টাইফয়েড ফিভারের বাসা !! হিঁদ্র কচ্ছেন, ভেতরে সাফ। বিলাতি কচ্ছেন, বাইরে সাফ।

চাই কি ?—পরিষ্কার শরীরে, পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখধোয়া দাঁতমাজা, সব চাই—কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। রাস্তা ঘাটও পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনী, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই। পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই। ‘আচারঃ পরমোধর্মঃ’—(মনু ১-১০৮) ; আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া—সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচার-ভ্রষ্টের কখন ধর্ম হবে ? অনাচারীর দুঃখ দেখছ না, দেখেও শিখছ না ? ওলাউঠা, এত মহামারী ম্যালেরিয়া, কার দোষ ? আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী।

আহার শুদ্ধ হলে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হলে আত্মসম্বন্ধী অচলা স্মৃতি হয়—এ শাস্ত্রবাক্য আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েই মেনেছেন। তবে শঙ্করাচার্যের মতে ‘আহার’ শব্দের অর্থ ‘ইন্দ্রিয়’, আর রামানুজাচার্যের মতে ‘ভোজ্যদ্রব্য’। সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

এই যে, দুই অর্থই ঠিক। বিশুদ্ধ আহার না হলে ইন্দ্রিয়সকল যথাযথ কার্য কি করেই বা করে? কদর্য আহারে ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণ শক্তির হ্রাস হয় বা বিপর্যয় হয়, এ কথা সকলেরই প্রত্যক্ষ। অজীর্ণ-দোষে এক জিনিষকে আর এক বলে ভ্রম হওয়া এবং আহারের অভাবে দৃষ্টি-আদি শক্তির হ্রাস সকলেই জানেন। সেই প্রকার কোনও বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা উপস্থিত করে, তাও ভূয়োদর্শনসিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাড়াখাড়ের বাচবিচার, তার মূলেও এই তত্ত্ব; যদিও অনেক বিষয়ে আমরা বস্ত্র ভুলে, আধারটা নিয়েই টানা-হেঁচড়া করছি এখন।

রামানুজাচার্য্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলছেন। জাতিদোষ, অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্য দ্রব্যের জাতিগত; যেমন প্যাজ-লসুন ইত্যাদি উদ্ভেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। আশ্রয়দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে আসে; ভ্রষ্ট লোকের অন্ন খেলেই ভ্রষ্টবুদ্ধি আসবেই, সতের অঙ্গে সংবুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্তদোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য কাট-কেশাদি-ভ্রষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ এবং নিমিত্তদোষ থেকে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বাঁচবার চেষ্টা সকলেই কর্তে পারে, আশ্রয়দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয়দোষ থেকে বাঁচবার জন্তই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গ ‘ছুঁয়ো-না ছুঁয়োনা’। তবে অনেকস্থলেই ‘উল্টা সমঝলি রাম’ হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে একটা কিছুতুকিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এস্থলে লোকাচার ছেড়ে লোক-গুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি জগদ্গুরুদের জীবন পড়ে দেখ, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি ব্যবহার করে গেছেন। জাতিহুঁষ্ট অন্নভোজন সম্বন্ধে, ভারতবর্ষের মত শিক্ষার স্থল এখনও পৃথিবীতে কোথাও নাই। সমস্ত ভূমণ্ডলে, আমাদের দেশের মত পবিত্র দ্রব্য আহার করে, এমন আর কোনও দেশ নেই। নিমিত্তদোষ সম্বন্ধে বর্তমানকালে বড়ই ভয়ানক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে; ময়রার দোকান, বাজারে-খাওয়া, এ সব মহা অপবিত্র দেখতেই পাচ্ছ, কিরূপ নিমিত্ত-দোষে হুঁষ্ট ময়লা আবর্জনা পচা-পকড় সব ওতে আছেন,—এর ফল হচ্ছে তাই। এই যে ঘরে ঘরে অজীর্ণ ও ঐ ময়রার দোকান, বাজারে-খাওয়ার ফল। এই যে প্রস্রাবের ব্যায়রামের প্রকোপ, ও ঐ ময়রার দোকান। ঐ যে পাড়াগাঁয়ে লোকের তত অজীর্ণদোষ প্রস্রাবের ব্যায়রাম হয় না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে

লুচি-কচুরি প্রভৃতি ‘বিষলডুকের’ অভাব। এ কথা বিস্তার করে পরে বলছি।

এই ত গেল খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে প্রাচীন সাধারণ নিয়ম! এ নিয়মের মধ্যে আবার অনেক মতামত প্রাচীনকালে চলেছে এবং আধুনিক কালে চলছে। প্রথম প্রাচীনকাল হতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এক আমিষ ও মহা বিবাদ, আমিষ আর নিরাмиষ। নিরাмиষ মাংস ভোজন উপকারক কি অপকারক? ভোজন তা ছাড়া জীবহত্যা গ্ৰায় বা অগ্ৰায়, এ এক মহা বিতণ্ডা চিরদিনের। একপক্ষ বলছেন—কোনও কারণে হত্যারূপ পাপ করা উচিত নয়; আর এক পক্ষ বলছেন—রাখ তোমার কথা, হত্যা না করলে প্রাণধারণই হয় না। শাস্ত্রবাদীদের ভেতর মহাগোল। শাস্ত্রে একবার বলছেন, যজ্ঞস্থলে হত্যা কর—আবার বলছেন, জীবঘাত করো না। হিঁদুরা সিদ্ধান্ত করছেন যে, যজ্ঞ ছাড়া অগ্ৰত্ব হত্যা করা পাপ। কিন্তু যজ্ঞ করে সুখে মাংস ভোজন কর। এমন কি, গৃহস্থের পক্ষে অনেকগুলি নিয়ম আছে যে, সে সে স্থলে হত্যা না করলে পাপ;—যেমন শ্রাদ্ধাদি। সে সকল স্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে মাংস না খেলে পশুজন্ম হয়—মহু বলছেন। অপরদিকে জৈন বৌদ্ধ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বৈষ্ণব বলছেন যে, তোমার শাস্ত্র মানিনি, হত্যা করা কিছুতেই হবে না। বৌদ্ধ সম্রাট আশোক, যে যজ্ঞ করবে, বা নিমজ্জন করে মাংস খাওয়াবে, তাকে সাজা দিচ্ছেন। আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে—তাদের ঠাকুর রাম, বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিবি ওড়াচ্ছেন—রামায়ণ মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত, আর হাজার কলসী মদ মানছেন।* বর্তমান কালে শাস্ত্রও শুনবে না ও মহাপুরুষ বলেছেন বল্লভও শোনে না। পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় ইত্যাদি। এক পক্ষ বলছেন যে মাংসাহারীর যত রোগ; অপর পক্ষ বলছেন ও গল্প-কথা তা হলে হিংস্রা নীরোগ হত, আর ইংরেজ আমেরিক প্রভৃতি প্রধান

* সীতামায়্য বাহুভ্যাং মধুমৈরেষকং শুচি ॥

পায়স্যামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিস্রো যথাস্মৃতং ।

মাংসানি চ স্মৃতিষ্ঠানি বিবিধানি ফলানি চ ॥

রামভাভাবহারার্থং কিঙ্করস্বর্ণমাহবন্ । রামায়ণ, উত্তর ৫১ ।

স্বরাঘটসহশ্ৰেণ মাংসভূতৌদনেন চ ।

যস্যেভ্যং প্রায়তাং দেবী পুরীং পুনরুপাগতা ॥

—রামায়ণ, অযোধ্যা ৫৫ ।

উভৌ মধ্যাসবক্ষিণৌ উভৌ চন্দনচর্চিতৌ ।

উভৌ পর্য্যঙ্করথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবাজ্জুনৌ ॥

—মহাভারত, আদিপর্ব ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

প্রধান মাংসাহারী জাত, রোগে লোপাট হয়ে যেত এতদিনে। একপক্ষ বলছেন যে ছাগল খেলে ছাগলে বৃদ্ধি হয়, শূয়ার খেলে শূয়ারের বৃদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বৃদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বলছেন যে, কর্পি খেলে কোপো বৃদ্ধি আলু খেলে, আলুয়ো বৃদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বৃদ্ধি। জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন যে, নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম কর্তে পারে; অপর পক্ষ বলছেন, তা হলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হতো; চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান ও প্রধান। মাংসাহারী বলছে, হিঁদু-চীনে দেখ, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে শাক-পাত্ড়া খেয়ে মরে, ওদের হৃদ্রুদ্র দেখ—আর জাপানীরাও ঐ ছিল; মাংসাহার আরম্ভ করে অবধি ওদের ডোল ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে দেড়লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় দেখ। উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। একপক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারে বদহজম, আর একপক্ষ বলছেন—সব ভুল, নিরামিষাশীগুলোরই যত পেটের

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

রোগ। একপক্ষ বলছেন, তোমার কোষ্ঠাশুদ্ধিরোগ শাক-পাত্ড়া খেয়ে জ্বোলাপবৎ ভাল হয়ে যায়, তা বলে কি ছুনিয়াশুদ্ধকে তাই করতে চাও? ফলকথা, চিরকালই মাংসাশী জাতেরাই যুদ্ধবীর চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী জাতেরা বলছেন যে যখন যজ্ঞের ধুম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে, এ বাবাজীডৌল হয়ে পর্যাস্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় মাংসাশীরা ভয়ে মাংসাহার ছাড়তে চায় না। আমাদের দেশে আর্য্য-সমাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাদ উপস্থিত। একপক্ষ বলছেন যে, মাংস খাওয়া একান্ত আবশ্যক; আর পক্ষ বলছেন, একান্ত অন্তায়। এই ত বাদ-বিবাদ চলছে। সকল পক্ষ দেখে-শুনে আমার ত বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্ম-কৰ্ম্ম-ভেদে আহালাদি সমস্তই পৃথক, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধৰ্ম্ম-জীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটে-খুটে এই সংসারের দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবন-তরী চালাতে হবে, তাকে সাংস খেতে হবে বৈ-কি। যতদিন মনুষ্যসমাজে এই ভাব থাকবে,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

‘বলবানের জয়,’ ততদিন মাংস খেতে হবে বা অন্ত্র কোনও রকম মাংসের জ্বায় উপযোগী আহার আবিষ্কার কর্তে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্বল পেয়া যাবে! রাম কি জ্বাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বল্পে চলে না—জাতি জাতির তুলনা করে দেখ।

আবার নিরামিষাশীদের মধ্যেও হচ্ছে কৌদল। একপক্ষ বলছেন যে, ভাত আলু গম যব জনার প্রভৃতি শর্করাপ্রধান খাদ্যও কিছুই নয়, ও সব মানুষে বানিয়েছে, ঐ সব খেয়েই যত রোগ। শর্করা-উৎপাদক (starchy) খাবার রোগের ঘর। ঘোড়া গরুকে পর্যাস্ত ঘরে বসে চাল-গম খাওয়ালে রুগী হয়ে যায়, আবার মাঠে ছেড়ে দিলে কচি ঘাস খেয়ে তাদের রোগ সেরে যায়। ঘাস শাক পাতা প্রভৃতি হরিৎ সবজিতে শর্করা-উৎপাদক পদার্থ বড় কম। বনমানুষ জাতি বাদাম ও ঘাস খায়, আলু গম ইত্যাদি খায় না; যদি খায় ত অপক অবস্থায়, যখন ষ্টার্চ (starch) অধিক হয় নি। এই সমস্ত নানাপ্রকার বিতণ্ডা চলছে। একপক্ষ বলছেন, শূন্য মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং দুগ্ধ এইমাত্র ভোজনই দীর্ঘ-জীবনের উপযোগী। বিশেষ ফল, ফলাহারী অনেক দিন পর্যাস্ত যুবা থাকবে, কারণ ফলের খাট্টা হাড়-গোড়ে জঙ্গ ধরতে দেয় না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

এখন সর্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয় এমন-খাওয়া খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে ;—যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল ?

ভাজা জিনিষগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ী। ঘি-তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন স্বাস্থ্যের দেশের খাদ্যের শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নাই, সমাধোচনা দেখতেই সাদা। গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাত্ত। আমাদের বাঙ্গলা দেশের জন্ত এখনও দূর পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাহাই প্রশস্ত। কোন্ প্রাচীন বাঙ্গালী কবি লুচি-কচুরীর বর্ণনা কচ্ছেন ? ও লুচি-কচুরী এসেছে পশ্চিম থেকে। সেখানেও কালেভদ্রে লোকে খায়। উপরি উপরি ‘পাকি রসুই,’ খেয়ে থাকে এমন লোক ত দেখি নি। মথুরার চোবে কুস্তিগীর লুচি-লড্ডু-ক-প্রিয় ; ছচার বৎসরেই চোবের হজমের সর্বনাশ হয়, আর চোবেজী চুরণ খেয়ে খেয়ে মরেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

গরীবরা খাবার জোটেনা বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাচ্ছ খেয়ে অনাহারে মরে। যা-তা পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকানের খাবারে খাচ্ছ-দ্রব্য কিছুই নেই, একদম উল্টো আছেন বিষ—বিষ—বিষ। পূর্বের লোকে কালে-ভজ্রে ঐ পাপগুলো খেত ; এখন সহরের লোক বিশেষ বিদেশী যারা সহরে বাস করে, তাদের নিত্য ভোজন হচ্ছে ঐ। এতে অজীর্ণরোগে অপমৃত্যু হবে তায় কি বিচিত্র। ক্ষিদে পেলে ও কচুরী-জিলিপি খানায় ফেলে দিয়ে, এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে। ভাত ডাল আটার-রুটি মাছ শাক দুধ যথেষ্ট খাচ্ছ। তবে ডাল দক্ষিণীদের মত খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোল-মাত্র, বাকিটা গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়সা থাকে, খাও, তবে ও পশ্চিমি নানা প্রকার গরম-মশলাগুলো বাদ দিয়ে। মশলাগুলো খাওয়া নয়—ওগুলো অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি পুষ্টিকর খাচ্ছ, তবে বড়ই দুস্পাচ্য। কচি কলাই-সুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদু ; পারি রাজধানীর ঐ সুপ একটি বিখ্যাত খাওয়া। কচি কলাইসুঁটি খুব সিক্ক করে, তারপর তাকে পিষে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তারপর একটা দুধছাঁকনির মত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

তারের ছাঁকনিতে ছাঁকলেই খোসাগুলো বেরিয়ে আসবে। এখন হলুদ ধনে জিরেমরিচ লঙ্কা, যা দেবার দিয়ে সাঁতলে নাও—উত্তম সুস্বাদু সুপাচ্য ডাল হল। যদি একটা পাঁঠার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে, ত উপাদেয় হয়।

ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধূম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, দুচার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকি সব বদহজম। পেটে পুরলেই কি খাওয়া হলো? যেটুকু হজম হবে, সেইটুকু খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদ হজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া দুটোই বদ-হজম। পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবের চিনি বা আলবুমেন (Albumen) দেখা দিয়েছে বলেই ‘হাঁ’ করে বসো না। ওসব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ না হতে পায়। কাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁট আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পার ছুটি নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থযাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার ফাক্তার কাছে আসতে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দিও না, ওরা অধিকাংশ ‘ভাল কর্তে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তা বল।’ পারত-পক্ষে ওষুধ খেয়ো না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা। পার যদি প্রতি বৎসর পূজার বন্ধের সময় হেঁটে দেশে যাও। ধন হওয়া, আর কুড়ের বাদশা হওয়া—দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধরে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা ত জীবন্ত রোগী, সেটা ত হতভাগা। যেটা লুচির ফুলকো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা ত মরে আছে। যে এক-দমে দশকোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো? সেধে রোগ অকালমৃত্যু ডেকে আনলে কে কি করবে?

আবার ঐ যে পাঁউরুটি উনিও হচ্ছেন বিষ, ঝুঁকে ছুঁয়ো না একদম। খাদ্যীর মিশলেই ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাঁড়ান। কোনও খাদ্যীরদার-জিনিষ থাকে না, এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্বপ্রকার খাদ্যীরদার-জিনিষের নিষেধ আছে, এ বড় সত্য। শাস্ত্রে যে কোনও জিনিষ মিষ্টি থেকে টেকেছে, তার নাম শুক্র; তা খেতে নিষেধ,—কেবল দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয়—উত্তম জিনিষ। যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয়, ত তাকে পুনর্ব্বার খুব আগুনে সেকে খেও। অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আমেরিকায় এখন জলশুদ্ধির বড়ই ধুম। এখন ঐ যে ফিল্টার, ওর দিন গেছে চুকে। অর্থাৎ ফিল্টার জলকে ছেঁকে দেয় মাত্র, কিন্তু রোগের বীজ যে সকল কীটানু তাতে থাকে, ওলাউঠা প্লেগের বীজ, তা যেমন তেমনি থাকে ; অধিকন্তু ফিল্টারটি স্বয়ং ঐ সকল বীজের জন্মভূমি হয়ে দাঁড়ান। কলকাতায় যখন প্রথম ফিল্টার করা জল হল, তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাউঠা হয় নাই ; তারপর যে-কে সেট, অর্থাৎ সে ফিল্টার মশাই এখন স্বয়ং ওলাউঠা বীজের আবাস হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ফিল্টারের মধ্যে দিশি তেকাঠার ওপর ঐ যে তিন কলসীর ফিল্টার উনিই উত্তম, তবে দু তিন দিন অন্তর বালি বা ময়লা বদলে দিতে হবে বা পুড়িয়ে দিতে হবে। আর ঐ যে একটু ফট্‌কির দেওয়া গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাস, ঐটি সকলের চেয়ে ভাল। ফট্‌কির গুঁড়ো যথাসম্ভব মাটি ময়লা ও রোগের বীজ সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গাজল জালায় পুরে একটু ফট্‌কির গুঁড়ো দিয়ে খিতিয়ে যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার বিলিতি ফিল্টার-মিল্টারের চোদ্দ-পুরুষের মাথায় ঝাঁটা মারে, কলের জলের হুশো বাপস্তু করে। তবে জল ফুটিয়ে নিতে পারলে নির্ভয় বটে। ফট্‌কির-খিতোন জল

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর, ফিলটার-মিলটার খানায় ফেলে দাও। এখন আমেরিকায় বড় বড় যন্ত্রযোগে জলকে একদম বাষ্প করে দেয়, আবার সেই বাষ্পকে জল করে, তারপর আর একটা যন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু তার মধ্যে পুরে দেয়, সে বায়ুটা বাষ্প হবার সময় বেরিয়ে যায়। সে জল অতি বিশুদ্ধ ; ঘরে ঘরে এখন দেখছি তাই। যার ছপয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলে গুলোকে নিত্য কচুরী মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত-রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলেপিলে-গুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না ত কি? এত বড় ষণ্ডা জাত ইংরেজ, এরা ভাজাভুজি মেঠাই মোণ্ডার নামে ভয় খায়, যাদের বরফান্ দেশে বাস, দিনরাত কসরত। আর আমাদের অগ্নিকুণ্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর ঘরে নড়ে বসতে চাইনি, আর আহাৰ লুচি-কচুরী মেঠাই—ঘিয়েভাজা, তেলেভাজা!! সেকেলে পাঁড়ার্গেয়ে জমিদার এক কথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, ছুকুড়ি কই মাছ কাঁটা-শুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলে-পিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি-কচুরী খায়, দিনরাত গাড়ী চড়ে, আর প্রশ্রাবের ব্যামো হয়ে মরে; ‘কলকেতা’ই হওয়ার এই ফল!!

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আর সর্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার বদ্দিগুলো। ওরা সর্বজান্তা, ওষুধের জোরে ওরা সব কর্তে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে, ত অমনি একটু ওষুধ দাও ; পোড়া বদ্দিও বলেনা যে, দূর কর ওষুধ, যা, তুক্রোশ হেঁটে আসগে যা। নানান্ দেশ দেখছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত ডাল ঝোল চচ্চড়ি, গুস্তো মোচার-ঘণ্টোর জন্ম পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাকতে তোমরা যে দাঁতের মর্যাদা বুঝছো না, এই আপ্শাস। খাবার নকল কি ইংরেজের কর্তে হবে—সে টাকা কোথায় ? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙ্গালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব-বাঙ্গলায়, ওদের নকল কর, যত পার। যত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবে, ততই খারাপ ; শেষ কলাইয়ের ডাল আর মাছের টুক্ মাত্র—আধা-সাঁওতালী বীরভূম বাঁকুড়ায় দাঁড়াবে !! তোমরা কলকত্তার লোক, ঐ যে এক সর্বনেশে ময়দার তালে হাতে মাটি দেওয়া ময়রার দোকানরূপ সর্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছ, ওর মোহিনীতে বীরভূম, বাঁকুড়া, ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেয়ালে লেপে দিয়েছে, টাকা বিক্রমপুরও টাইমাছ, কচ্ছপাদি জলে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ছেড়ে দিয়ে, 'সইভা' হচ্ছে !! নিজেরা ত উচ্ছন্ন
গেছ, আবার দেশশুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমরা বড্ড
সভ্য, সহুরে লোক ! তোমাদের মুখে ছাই ! ওরাও
এমনি আহান্মক যে, ঐ কলকেতার আবর্জনাগুলো
খেয়ে উদরাময় হয়ে মর-মর হবে তবু বলবে না, যে
এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে—নোনা লেগেছে !!
কোনও রকম করে সহুরে হবে !!

খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে ত এই মোট কথা শুনলে।

পাশ্চাত্যদের এখন পাশ্চাত্যেরা কি খায় এবং তাদের
আহার আহারের ক্রমশঃ কেমন পরিবর্তন হয়েছে,
তাও কিছু বলি।

গরীব অবস্থায় সকল দেশের খাওয়াই খাণ্ডবিশেষ ;
এবং শাক তরকারি, মাংস মাংস বিলাসের মধ্যে এবং
চাটনির মত ব্যবহৃত হয়। যে দেশে যে শস্য প্রধান
ফসল, গরীবদের প্রধান খাওয়া তাই ; অন্যান্য জিনিষ
আলুসজ্জিক। যেমন বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ
উপকূলে ও মালাবার উপকূলে ভাত প্রধান খাণ্ড ;
তার সঙ্গে ডাল, তরকারী, কখন কখন মাছ মাংস
চাটনিবৎ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য সর্বদেশে অবস্থাপন্ন লোকের
জ্ঞান গমের রুটি ও ভাত ; সাধারণ লোকের

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

নানাপ্রকার বজ্রা, মড়ুয়া, জনার, ঝিঞ্জোরা প্রভৃতি ধাতুর রুটি প্রধান খাদ্য।

শাক তরকারি ডাল মাছ মাংস সমস্তই সমগ্র ভারতবর্ষে এই রুটি বা ভাতকে সুস্বাদু করবার জন্য ব্যবহার—তাই ওদের নাম ব্যঞ্জন। এমন কি পাঞ্জাব রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্যদেশে অবস্থাপন্ন আমিষাশী লোকেরাও এমন কি রাজারাও যদি নিত্য নানাপ্রকার মাংস ভোজন করেন, তথাপি রুটি বা ভাতই প্রধান খাদ্য। যে ব্যক্তি আধসের মাংস নিত্য খায়, সে এক সের রুটি তার সঙ্গে নিশ্চিত খায়।

পাশ্চাত্যদেশে এখন যে সকল গরীব দেশ আছে এবং ধনী দেশের গরীবদের মধ্যে এই প্রকার রুটি এবং আলুই প্রধান খাদ্য ; মাংসের চাট্‌নি মাত্র—তা-ও কালে ভেদে। স্পেন, পোর্টুগাল, ইতালি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশে যথেষ্ট ড্রাক্সা জন্মায় এবং ড্রাক্সা-ওয়াইন্ অতি সস্তা। সে সকল ওয়াইনে মাদকতা নাই (অর্থাৎ পিপে-খানেক না খেলে ত আর নেশা হবে না এবং তা কেউ খেতেও পারে না) এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। সে দেশের দরিদ্র লোকে এজন্য মাছ-মাংসের জায়গায় এই ড্রাক্সা-রস দ্বারা পুষ্টি সংগ্রহ করে। কিন্তু উত্তরাঞ্চল, যেমন রুশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে দরিদ্র

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

লোকের আহার প্রধানতঃ রাই-নামক ধাতুর রুটি ও এক আধটুকরা শুটকি মাছ ও আলু।

ইউরোপের অবস্থাপন্ন লোকের এবং আমেরিকার আবালবৃদ্ধবনিতার খাওয়া আর এক রকম, অর্থাৎ রুটি, ভাত প্রভৃতি চাটুনি এবং মাছ মাংসই হচ্ছে খাওয়া। আমেরিকায় রুটি খাওয়া নাই বললেই হয়। মাছ মাছই এলো, মাংস মাংসই এলো, তাকে অমনি খেতে হবে, ভাত-রুটির সংযোগে নয়। এবং এজন্য প্রত্যেক বারেই থালা বদলান হয়। যদি দশটা খাবার জিনিষ থাকে ত দশবার থালা বদলাতে হয়। যেমন মনে কর, আমাদের দেশে প্রথমে শুধু শুক্ক এলো, তারপর থালা বদলে শুধু ডাল এলো, আবার থালা বদলে শুধু ঝোল এলো, আবার থালা বদলে দুটি ভাত, নয় ত দুখান লুচি ইত্যাদি। এর লাভের মধ্যে এই যে, নানা জিনিষ অল্প অল্প খাওয়া হয়, পেট বোঝাই করা হয় না। ফরাসী-চাল সকালবেলা ‘কাফি’ এবং এক আধ টুকরো রুটি-মাখম; দুপুর বেলা মাছ মাংস ইত্যাদি মধ্যবিৎ; রাত্রে লম্বা খাওয়া। ইতালি, স্পেন প্রভৃতি জাতিদের ঐ এক রকম; জর্জাণরা ক্রমাগত খাচ্ছে,—পাঁচ বার, ছ বার, প্রত্যেক বারেই অল্প-বিস্তর মাংস। ইংরাজরা তিনবার; সকালে অল্প, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কাফি-যোগ, চা-যোগ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আছে। আমেরিকাদের তিনবার—উত্তম ভোজন, মাংস প্রচুর। তবে এ সকল দেশেই ‘ডিনার’টা প্রধান খাদ্য—ধনী হলে, তার ফরাসী রাঁধুনী এবং ফরাসী চাল। প্রথমে একটু-আধটু নোনা মাছ বা মাছের ডিম, বা কোনও চাটনি বা সব্জি। এটা হচ্ছে ক্ষুধাবৃদ্ধি, তারপর সূপ; তারপর আজকাল ফাসান্-একটা ফল; তারপর মাছ, তারপর মাংসের একটা তরকারী; তারপর থান্-মাংস শূলা, সঙ্গে কাঁচা সব্জি; তারপর আরণ্য-মাংস মৃগপক্ষ্যাদি; তারপর মিষ্টান্ন, শেষ কুল্লী,—‘মধুরেণ সমাপয়েৎ।’ ধনী হলে প্রায় প্রত্যেক বার খাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মদ বদলাচ্ছে,—সেরি, ক্লারেট, স্ত্রামপাঁ ইত্যাদি এবং মধ্যে মধ্যে মদের কুল্লী একটু-আধটু। খাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চামচ সব বদলাচ্ছে। আহা়া়াস্তে ‘কাফি’—বিনা দুগ্ধ, আসব-মদ্য খুদে খুদে গ্লাসে এবং ধূমপান। খাওয়ার রকমারির সঙ্গে মদের রকমারি দেখাতে পারলে, তবে ‘বড়মানুষি চাল’ বলবে। একটা খাওয়ায় আমাদের দেশের একটা মধ্যবিত্ত লোক সর্বস্বাস্ত হতে পারে, এমন খাওয়ার ধুম এরা করে।

আর্য্যারা একটা পীঠে বসত, একটা পীঠে ঠেসান দিত এবং জলচৌকীর উপর থালা রেখে, এক

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

থালেতেই সকল খাওয়া খেত। ঐ চাল এখনও পাঞ্জাব রাজপুতানা মহারাজ্য ও গুজ্জর দেশে বিদ্যমান। বাঙ্গালী উড়ে তেলিঙ্গি মালাবারি প্রভৃতি মাটিতেই “সাপ্‌ড়ান’। মহীশূরের মহারাজও মাটিতে আঙ্গু পাতে ভাত ডাল খান। মুসলমানেরা চাদর পেতে খায়। বর্ষি জাপানী প্রভৃতি উপু হয়ে বসে মাটিতে থালা রেখে খায়। চীনেরা টেবিলে খায়; চেয়ারে বসে, কাটি ও চামচ যোগে খায়। রোমান ও গ্রীকরা কোচে শুয়ে টেবিলের ওপর থেকে হাত দিয়ে খেত। ইউরোপীরা টেবিলের ওপর হতে, কেরারায় বসে, হাত দিয়ে পূর্বে খেত; এখন নানা প্রকার কাঁটা-চামচ।

চীনের খাওয়াটা কসরৎ বটে—যেমন আমাদের পানওয়ালীরা ছুখানা সম্পূর্ণ আলাদা লোহার পাতকে হাতের কায়দায় কাঁচির কাজ করায়, চীনেরা তেমনি ছোটো কাটিকে ডান-হাতের ছোটো আঙ্গুল আর মুটোর কায়দায় চিমুটের মত করে শাকাদি মুখে তোলে। আবার ছোটোকে একত্র করে, এক বাটি ভাত মুখের কাছে এনে, ঐ কাটিদ্বয়নির্মিত খোস্তাযোগে ঠেলে-ঠেলে মুখে পোরে।

সকল জাতিরই আদিম পুরুষ নাকি প্রথম অবস্থায় যা পেত তাই খেত। একটা জানোয়ার মারলে, সেটাকে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

এক মাস ধরে খেত ; পচে উঠলেও তাকে ছাড়ত না।
ক্রমে সভা হয়ে উঠলো, চাষ-বাস শিখলে ; আরণ্য
পশুকুলের মত একদিন বেদম্ খাওয়া, আর ছু পাঁচ-দিন
অনশন, ক্রমে ঘুচলো ; আহার নিত্য জুটতে
লাগল ; কিন্তু পচা জিনিষ খাবার চাল একটা দাঁড়িয়ে
গেল। পচা দুর্গন্ধ একটা যা হয় কিছু, আবশ্যক ভোজ্য
হতে নৈমিত্তিক আদরের চাটনি হয়ে দাঁড়াল।

এক্ষুইমা জাতি বরফের মধ্যে বাস করে। শস্য সে
দেশে একদম জন্মায় না ; নিত্য ভোজন—মাছ মাংস ;
১০।১২ দিনে অরুচি বোধ হলে, একটুকুরা পচা মাংস
খায়—অরুচি সারে।

ইউরোপীরা এখনও, বহু পশু-পক্ষীর মাংস না
পচলে খায় না। তাজা পেলেও তাকে টাঙ্গিয়ে রাখে—
যতক্ষণ না পচে দুর্গন্ধী হয়। কলকেতায় পচা হরিণের
মাংস পড়তে পায় না ; রসা ভেটকির উপাদেয়তা
প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পনীর যত পচবে, যত পোকা
কিলবিল করবে, ততই উপাদেয়। পলায়মান পনীর-
কীটকেও তাড়া করে ধরে মুখে পুর্বে—তা নাকি বড়ই
সুস্বাদু !! নিরামিষাশী হয়েও পঁাজ-লসুনের জন্তু ছোঁক
ছোঁক করবে, দক্ষিণি বামুনের পঁাজ-লসুন নইলে
খাওয়াই হবে না। শাস্ত্রকারেরা সে পথও বন্ধ করে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দিলেন। পঁয়াজ লম্বুন, গোঁয়ো শোর, গোঁয়ো মুরগি খাওয়া এক জাতের পাপ, সাজা—জাতিনাশ। যারা শুনলে এ কথা, তারা ভয়ে পঁয়াজ লম্বুন ছাড়লে, কিন্তু তার চেয়ে বিষমদুর্গন্ধ হিংগ খেতে আরম্ভ করলে! পাহাড়ী গোঁড়া হিং লম্বনে-মাস পঁয়াজ-লম্বুনের জায়গায় ধরলে। ও দুটোর নিষেধ ত আর পুঁথিতে নেই !!

সকল ধর্ম্মেই খাওয়া-দাওয়ার একটা বিধি-নিষেধ আছে; নাই কেবল খ্রিস্টানি ধর্ম্মে।
আহার সম্বন্ধীয় বিধি নিষেধের তাৎপর্য জৈন, বৌদ্ধ মাহ মাংস খাবেই না। জৈন আবার যা মাটির নীচে জন্মায়, আলু মুলো প্রভৃতি, তাও খাবে না। খুঁড়তে গেলে পোকা মরবে, রাত্রে খাবে না—অন্ধকারে পাছে পোকা খায়।

য়াহুদীরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শোর খাবে না, যে জানোয়ার দ্বিশফ নয় এবং জাবর কাটে না, তাকেও খাবে না। আবার বিষম কথা, দুধ বা দুগ্ধোৎপন্ন কোনও জিনিষ যদি হেঁসেলে ঢোকে, যখন মাছ-মাংস রান্না হচ্ছে, ত সে সব রান্না ফেল দিতে হবে। এ বিষয় গোঁড়া যাহুদী অল্প কোনও জাতির রান্না খায় না! আবার হিংস্র মত যাহুদীরা বুখা-মাংস খায় না। যেমন বাঙ্গলা দেশ ও পঞ্জাবে মাংসের নাম 'মহাপ্রসাদ'। যাহুদীরা সেই প্রকার মহাপ্রসাদ অর্থাৎ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

যথানিয়মে বলিদান না হলে মাংস খায় না। কাজেই হিঁদুর মত যাহুদীদেরও যে-সে দোকান হতে মাংস কেনবার অধিকার নেই। মুসলমানেরা যাহুদীদের অনেক নিয়ম মানে, তবে অত বাড়াবাড়ি করে না; ছুধ, মাছ, মাংস, একসঙ্গে খায় না এইমাত্র, ছোঁয়া-ছুঁয়ি হলেই যে সর্বনাশ, অত মানে না। যাহুদীদের আর হিঁদুদের অনেক সৌসাদৃশ্য—খাওয়া সম্বন্ধে; তবে যাহুদীরা বুনো শোরও খায় না, হিঁদুরা খায়। পাঞ্জাবে মুসলমান-হিঁদুর বিষম সংঘাত থাকায়, বুনো শোর আবার হিঁদুদের একটা অত্যাবশ্যক খাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুতদের মধ্যে বুনো শোর শিকার করে খাওয়া, একটা ধর্মবিশেষ। দক্ষিণদেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতির মধ্যে গৌঁও শোরও যথেষ্ট চলে। হিঁদুরা বুনো মুরগি খায়, গৌঁও খায় না। বাঙ্গালা দেশ থেকে নেপাল ও আ-কাশ্মীর হিমালয়—এক রকম চলে চলে। মনুস্ক খাওয়ার প্রথা এই অঞ্চলেই সমধিক বিদ্যমান আজও।

কিন্তু কুমায়ুন হতে আরম্ভ করে কাশ্মীর পর্য্যন্ত, বাঙ্গালী, বেহারী, প্রয়াগী ও নেপালীর চেয়েও মনুর আইন বিশেষ প্রচার। যেমন বাঙ্গালী মুরগি বা মুরগির ডিম খায় না, কিন্তু হাঁসের ডিম খায়, নেপালীও

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

তাই ; কিন্তু কুমায়ুন হতে তাও চলে না। কাশ্মীরীরা বুনো হাঁসের ডিম পোলে সুখে খায়, গ্রাম্য নয়।

আলাহাবাদের পর হতে, হিমালয় ছাড়া, ভারতবর্ষের অল্প সমস্ত দেশে যে ছাগল খায়, সে মুরগিও খায়।

এই সকল বিধি-নিষেধের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বাস্থ্যের জন্ত, তার সন্দেহ নাই। তবে সকল জায়গায় সমান পারে না। শোর মুরগি যা-তা খায়, অতি অপরিষ্কার জানোয়ার—কাজেই নিষেধ ; বুনো জানোয়ার কি খায়—কে দেখতে যায়, বল। তা ছাড়া রোগ—বুনো জানোয়ারে কম।

দুধ, পেটে অগ্নাধিক হলে একেবারেই দুপাচ্য এমন কি একদমে এক গ্রাস দুধ খেয়ে কখন কখন সত্ত্বঃ মৃত্যু ঘটেছে। দুধ—যেমন শিশুতে মাতৃসত্ত্ব পান করে, তেমনি ঢোকে-ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরী লাগে। দুধ একটা গুরুপাক জিনিষ, মাংসের সঙ্গে হজম আরও গুরুপাক—কাজেই এ নিষেধ স্বাস্থ্যদীদের মধ্যে। মুখ্‌ মাতা কচিছেলেকে জোর করে ঢক্-ঢক্ করে দুধ খাওয়ায় আর ছ-ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে॥ এখনকার ডাক্তারের পূর্ণ বয়স্কের জন্তেও একপোয়া দুধ আস্তে-আস্তে আধ ঘণ্টায় খাওয়ার বিধি দেন ; কচি ছেলেদের জন্ত ‘ফিডিং

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বটল' ছাড়া উপায়ান্তর নেই। মা ব্যস্ত কাজে—দাসী একটা ঝিনুকে করে ছেলেটাকে চেপে ধরে সঁ-সঁ হুধ খাওয়াচ্ছে !! লাভের মধ্যে এই যে রোগা-পটকাগুলো আর বড়, বড় হচ্ছে না, তারা এখানেই জন্মের শোধ হুধ খাচ্ছে ; আর যে গুলো এ বিষম খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে ঠেলে-ঠেলে উঠছে সে গুলো প্রায় সুস্থকায় এবং বলিষ্ঠ।

সেকালে অঁতুড় ঘর, হুধ খাওয়ান প্রভৃতির হাত থেকে যে ছেলেপিলেগুলো বেঁচে উঠত, সে গুলো একরকম সুস্থ-সবল আজীবন থাকত। মা যষ্টীর সাক্ষাৎ বরপুত্র না হলে কি আর সেকালে একটা ছেলে বাঁচত !! সে তাপসেঁক দাগাফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতি ও প্রসূত উভয়েরই পক্ষে হুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। হরিল্লুঠের তুলসীতলার খোকা ও মা— দুই প্রায় বেঁচে যেত, সাক্ষাৎ যমরাজের দূত চিকিৎসকের হাত এড়াতে বোলে।

সকল দেশেই কাপড়ে চোপড়ে কিছু না কিছু ভদ্রতা লেগে থাকে। 'ব্যাতন না জান্লে বোজ্র অবোজ্র বুঝবো ক্যাম্‌নে?' শুধু ব্যাতনে নয়, কাপড় না দেখলে বোজ্র অবোজ্র বুঝবো ক্যাম্‌নে' সর্বদেশে কিছু না কিছু চলন। আমাদের দেশে শুধু গায়ে ভদ্রলোক রাস্তায় বেরুতে পারে

কাপড়ে
সত্যতা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

না, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আবার পাগড়ী না মাথায় দিয়ে কেউই রাস্তায় বেরোয় না। পাশ্চাত্য দেশে ফরাসিরা বরাবর সকল বিষয়ে অগ্রণী,—তাদের খাওয়া, তাদের পোষাক সকলে নকল করে। এখনও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে, বিশেষ বিশেষ পোষাক বিদ্যমান, কিন্তু ভজ হলেই, ছপয়সা হলেই, অমনি সে পোষাক অন্তর্ধান, আর ফরাসি পোষাকের আবির্ভাব। কাবুলী পাজামা-পরা ওলন্দাজি চাষা, ঘাঘরা-পরা গ্রীক, তিব্বতি-পোষাক-পরা রুষ, যেমন ‘বোজ’ হয়, অমনি ফরাসি কোট প্যান্টালুনে আবৃত হয়। মেয়েদের ত কথাই নেই, তাদের পয়সা হয়েছে কি পারি রাজধানীর পোষাক পরতে হবেই হবে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী এখন ধনী জাত ; ওসব দেশে সকলেরই একরকম পোষাক—সেই ফরাসি নকল। তবে আজকাল পারি অপেক্ষা লণ্ডনে পুরুষদের পোষাক ভব্যতর, তাই পুরুষদের পোষাক ‘লণ্ডন মেড্’ আর মেয়েদের পারিসিয়েন নকল। যাদের বেশী পয়সা, তারা ঐ দুই স্থান হতে তৈরী পোষাক বারমাস ব্যবহার করে। আমেরিকা বিদেশী আমদানী পোষাকের উপর ভয়ানক মাণ্ডুল বসায়, সে মাণ্ডুল দিয়েও পারি লণ্ডনের পোষাক পঠে হবে। এ কাজ একা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আমেরিকার পারে—আমেরিকা এখন কুবেরের প্রধান আড্ডা !

প্রাচীন আৰ্য্যজাতির ধুতি-চাদর পরত ; ক্ষত্রিয়-দের ইজার ও লম্বা জামা, লড়ায়ের সময় । অশ্ব সময় সকলেরই ধুতি-চাদর । কিন্তু পাগড়ীটা ছিল । অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে-মন্দে পাগড়ী পরত । এখন যেমন বাঙ্গালা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কপনী মাত্র থাকলেই শরীর ঢাকার কাজ হলো, কিন্তু পাগড়ীটা চাই, প্রাচীনকালেও তাই ছিল, মেয়ে-মন্দে । বৌদ্ধদের সময়ের যে সকল ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া যায়, তারা মেয়ে-মন্দে কোপীন-পরা । বুদ্ধদেবের বাপ কপনী পরে বসেছেন সিংহাসনে ; তদ্বং মা-ও বসেছেন—বাড়ার ভাগ, এক পা মল ও এক হাত বালা ; কিন্তু পাগড়ী আছে !! সম্রাট ধর্ম্মাশোক ধুতি পরে, চাদর গলায় ফেলে, আছুড় পায়ে, একটা ডমরু-আকার আসনে বসে নাচ দেখছেন ! নর্ত্তকীরা দিব্যি উলঙ্গ ; কোমর থেকে কতকগুলো শ্যাকড়ার ফালি বুলছে । মোদা, পাগড়ী আছে । ‘নেবু-টেবু’ সব ঐ পাগড়ীতে । তবে রাজ-সামন্তরা ইজার ও লম্বা জামা পরা—চোস্ত ইজার ও চোগা । সারথি নলরাজ এমন রথ চালালেন যে, রাজা ঋতুপর্ণের চাদর কোথায় পড়ে রইল ; রাজা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ঋতুপর্ণ আছড় গায়ে বে করতে চললেন। ধুতি-চাদর আর্ধ্যদের চিরন্তন পোষাক, এই জন্তাই ক্রিয়াকর্মের বেলায় ধুতি-চাদর পরতেই হয়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের পোষাক ছিল ধুতি-চাদর ; একখান বৃহৎ কাপড় ও চাদর—নাম ‘তোগা’, তারি অপভ্রংশ এই ‘চোগা’। তবে কখনও কখনও একটা পিরহানও পরা হত। যুদ্ধকালে ইজার-জামা। মেয়েদের একটা খুব লম্বা চোড়া চারকোণা জামা, যেমন ছুখানা বিছানার চাদর লম্বা-লম্বি সেলাই করা, চওড়া দিক্ খোলা। তার মধ্যে ঢুকে কোমরটা বাঁধলে হবার—একবার বৃকের নীচে, একবার পেটের নীচে। তারপর উপরের খোলা ছপাট ছ হাতের উপর ছ জায়গায় তুলে মোটা ছুঁচ দিয়ে আটকে দিলে—যেমন উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ীরা কম্বল পরে। সে পোষাক অতি সুন্দর ও সহজ। ওপরে একখান চাদর।

কাটা কাপড় এক ইরাণীরা প্রাচীনকাল হতে পরত। বোধ হয় চীনেদের কাছে শেখে। চীনেরা হচ্ছে সভ্যতার অর্থাৎ ভোগবিলাসের সুখস্বচ্ছন্দতার আদ-গুরু। অনাদি কাল হতে চীনে টেবিলে খায়, চেয়ারে বসে, যন্ত্র-তন্ত্র কত খাওয়ার জন্ত, এবং কাটা পোষাক নানা রকম, ইজাব জামা টুপিটাপা পরে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সিকন্দর-সা ইরান জয় করে, ধুতি-চাদর ফেলে ইজার পরতে লাগলেন। তাতে তাঁর স্বদেশী সৈন্যেরা এমন চটে গেল যে বিদ্রোহ হবার মত হয়েছিল। মোদ্দা, সিকন্দর নাছাড় পুরুষ—ইজার-জামা চালিয়ে দিলেন।

গরমদেশে কাপড়ের দরকার বড় হয় না। কোপীন-মাত্রেই লজ্জানিবারণ, বাকি কেবল অলঙ্কার। ঠাণ্ডা-দেশে শীতের চোটে অস্থির, অসভ্য অবস্থায় জানোয়ারের ছাল টেনে পরে, ক্রমে কস্থল পরে, ক্রমে জামা-পাজামা ইত্যাদি নানান খানা হয়। তারপর আছড়-গায়ে গয়না পরতে গেলেইত ঠাণ্ডায় মৃত্যু, কাজেই অলঙ্কার-প্রিয়তাটা ঐ কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে। যেমন আমাদের দেশের গয়নার ফ্যাসান বদলায়, এদের তেমনি ঘড়ি-ঘড়ি বদলাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাসান।

ঠাণ্ডাদেশমাত্রেই এজ্ঞা সর্বদা সর্বদা না ঢেকে কারুর সামুনে বেরুবার যো নেই। বিলেতে ঠিক ঠিক পোষাকটি না পরে ঘরের বাইরে যাবার যো নেই। পাশ্চাত্যদেশের মেয়েদের পা দেখান বড়ই লজ্জা কিন্তু গলা ও বুকের খানিকটা দেখান যেতে পারে। আমাদের দেশে মুখ দেখান বড়ই লজ্জা; কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে সাড়ী কোমরে ওঠেন উঠুন, তায়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দোষ নেই। রাজপুতনার ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখান !

পাশ্চাত্যদেশের নর্তকী ও বেশারা লোক ভুলাবার জন্ত অনাচ্ছাদিত। এদের নাচের মানে তালে তালে শরীর অনাবৃত করে দেখান। আমাদের দেশের আতুড় গা ভদ্রলোকের মেয়ের, নর্তকী বেশা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। পাশ্চাত্যদেশে মেয়েছেলে সর্ব্বদাই গা ঢাকা, গা আতুড় করলে আকর্ষণ বেশী হয় ; আমাদের দেশে দিন-রাত আতুড় গা, পোষাক পরে ঢেকে ঢেকে থাকলেই আকর্ষণ অধিক। মালাবার দেশে মেয়ে-মন্দের কোপীনের উপর বহির্বাসমাত্র, আর বস্ত্রমাত্রই নেই। বাঙ্গালীরও তাই, তবে কোপীন নাই এবং পুরুষদের সাক্ষাতে মেয়েরা গা-টা মুড়ি-ঝুড়ি দিয়ে ঢাকে।

পাশ্চাত্যদেশের পুরুষে পুরুষে সর্ব্বাঙ্গে অক্লেশে উলঙ্গ হয়—আমাদের মেয়েদের মত। বাপ-ছেলেয় সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ করে স্নানাদি করে, দোষ নেই। কিন্তু মেয়েদের সামনে, বা রাস্তা ঘাটে, বা নিজেদের ঘর ছাড়া, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা চাই।

এক চীনে ছাড়া সর্ব্বদেশেই এ লজ্জা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বিষয় দেখছি—কোনও বিষয়ে বেজায় লজ্জা, আবার তদপেক্ষা অধিক লজ্জাকর বিষয়ে আদতে লজ্জা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

নেই। চীনে মেয়ে-মদে সর্বদা আপাদমস্তক ঢাকা। চীনে কনফুছের চেলা, বুদ্ধের চেলা, বড় নীতি ছরস্ত। খারাপ কথা চালচলন—তৎক্ষণাৎ সাজা। কৃশ্চান পাজী গিয়ে চীনে ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে ফেল্লে। এখন বাইবেল-পুরাণ হচ্ছেন হিঁহুর পুরাণের চোদ্দ পুরুষ—সে দেবতা মানুষের অদ্ভুত কলেঙ্কার পড়ে চীনে ত চটে অস্থির। বল্লে, ‘এই বই কিছুতেই এদেশে চালান হবে না, এ—ত—অতি অশ্লীল কেতাব’; তার উপর পাজিনী বুকখোলা সাক্ষ্য পোষাক পরে, পর্দার বার হয়ে, চীনদের নিমন্ত্রণে আহ্বান করলেন। চীনে মোটাবুদ্ধি বল্লে—‘সর্বনাশ! এই খারাপ বই পড়িয়ে, আর এই মাগীদের আছড় গা দেখিয়ে, আমাদের ছোঁড়া বইয়ে দিতে এ ধর্ম এসেছে।’ এই হচ্ছে চীনের কৃশ্চানের উপর মহা-ক্রোধ। নতুবা চীনে কোনও ধর্মের উপর আঘাত করে না। শুন্ছি যে, পাজীরা এখন অশ্লীল অংশ ত্যাগ করে বাইবেল ছাপিয়েছে; কিন্তু চীনে তাতে আরও সন্দীহান।

আবার এ পাশ্চাত্যদেশে, দেশবিশেষে লজ্জাঘেন্নার—তারতম্য আছে। ইংরেজ আমেরিকার লজ্জা-সরম একরকম; ফরাসির আর একরকম; জার্মানের আর একরকম। রুষ আর তিব্বতী বড় কাছাকাছি; তুরকের আর এক ভৌল; ইত্যাদি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আমাদের দেশের চেয়ে ইয়োরোপে ও আমেরিকায় মলমূত্রাদি ত্যাগে বড়ই লজ্জা। আমরা হচ্ছি নিরামিষ-

ভোজী—এক কাঁড়ি ঘাস-পাতা আহার।

চালচলন

আবার বেজায় গরম দেশ, এক দমে লোটাভর জল খাওয়া চাই। পশ্চিমী চাষা সেরভর ছাতু খেলে; তারপর পাতকোকে পাতকোই খালি করে ফেললে, জল খাওয়ার চোটে। গরমী কালে আমরা বাঁশ বার করে দিই, লোককে জল খাওয়াতে। কাজেই সে সব যায় কোথা, বল? দেশ বিষ্ঠামূত্রময় না হয়ে যায় কোথা? গরুর গোয়াল, ঘোড়ার আস্তাবল, আর বাঘ-সিঙ্গির পিঁজরার তুলনা কর দিকি!

কুকুর আর ছাগলের তুলনা কর দিকি? পাশ্চাত্য দেশের আহার মাংসময়, কাজেই অল্প; আর ঠাণ্ডা দেশ জল খাওয়া নেই বলেই হয়। ভদ্রলোকের খুদে-খুদে গ্রাসে একটু মদ খাওয়া। ফরাসিরা জলকে বলে ব্যাঙের রস, তা কি খাওয়া চলে? এক আমেরিক জল খায় কিছু বেশী, কারণ ওদেশ গরমী-কালে ভয়ঙ্কর গরম, নিউইয়র্ক কলকেতার চেয়েও গরম। আর জার্মানরা বড্ড ‘বিয়র’ পান করে—কিন্তু সে খাবার সঙ্গে নয় বড়।

ঠাণ্ডা দেশে সর্দি লাগবার সদাই সম্ভাবনা; গরম

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দেশে খেতে বসে ঢক্-ঢক্ জল। এরা কাজেই না
হেঁচে যায় কোথা, আর আমরা ঢেঁকুর না তুলেই বা
যাই কোথা? এখন দেখ নিয়ম—এ দেশে খেতে বসে
যদি ঢেঁকুর তুলেছ ত সে বেয়াদবীর আর পার নেই।
কিন্তু রুমাল বার করে তাতে ভড়-ভড় করে
সিক্‌নি ঝাড়, এদের তায় ঘেন্না হয় না। আমাদের
ঢেঁকুর না তুললে নিমন্ত্রক খুসীই হন না; কিন্তু পাঁচ
জনের সঙ্গে খেতে খেতে ভড়-ভড় করে সিক্‌নি ঝাড়াটা
-কেমন?

ইংলণ্ডে আমেরিকায় মলমূত্রের নামটি আনবার যো
নেই মেয়েদের সাম্নে। পাইথানায় যেতে হবে চুরি
করে। পেট গরম হয়েছে, বা পেটের কোনও প্রকার
অসুখের কথা মেয়েদের সাম্নে বলবার যো নেই।
অবশ্য, বুড়ী-টুড়ি আলাপী আলাদা কথা। মেয়েরা
মলমূত্র চেপে মরে যাবে, তবুও পুরুষের সাম্নে ও
নামটিও আনবে না।

ফরাসিদেশে অত নয়। মেয়েদের মলমূত্রের স্থানের
পাশেই পুরুষদের, এরা এ দোর দিয়ে যাচ্ছে; ওরা ও
দোর দিয়ে যাচ্ছে; অনেক স্থানে এক দোর, ঘর
আলাদা। রাস্তার ছ'ধারে মাঝে মাঝে প্রস্ত্রাবের স্থান,
তা খালি পিঠটা ঢাকা পড়ে মাত্র; মেয়েরা দেখছে, তায়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

লজ্জা নাই,—আমাদের মত । অবশ্য মেয়েরা অমন অনাবৃত স্থানে যায় না । জার্মানদের আরও কম ।

ইংরেজ আমেরিকরা কথাবার্তায়ও বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে । সে ঠ্যাঙ বলবার পর্য্যন্ত জো নেই । ফরাসিরা আমাদের মত মুখ খোলা ; জার্মান, রুষ প্রভৃতি সকলের সামনে থিস্তি করে ।

কিন্তু প্রেম-প্রণয়ের কথা অবাধে মায় ছেলে, ভায়ে বোনে বাপে—তা চলেছে । বাপ মেয়ের প্রণয়ীর (ভবিষ্যৎ বরের) কথা নানা রকম ঠাট্টা করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে । ফরাসির মেয়ে তায় অবনতমুখী, ইংরেজের মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিনের মেয়ে চোট-পাট জবাব দিচ্ছে । চুম্বন, আলিঙ্গনটা পর্য্যন্ত দোষাবহ নয়, অশ্লীল নয় । সে সব কথা কওয়া চলে । আমেরিকায় পরিবারের পুরুষবন্ধুও আত্মীয়তা হলে, বাড়ীর যুবতী মেয়েদেরও সেকছাণ্ডের স্থলে চুম্বন করে । আমাদের দেশে প্রেম প্রণয়ের নামগন্ধটি পর্য্যন্ত গুরুজনের সামনে হবার যো নেই ।

এদের অনেক টাকা । অতি পরিষ্কার এবং কেতাদোরস্ত কাপড় না পরলে সে ছোটলোক,—তার সমাজে যাবার যো নেই । প্রত্যহ দোপদস্ত কামিজ, কলার প্রভৃতি ছবার তিনবার বদলাতে হবে ভদ্র-

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

লোককে ! গরীবরা অত শত পারে না। ওপরের কাপড়ে একটি দাগ, একটি কৌচকা থাকলেই মুঞ্চিল। নখের কোণে, হাতে, মুখে একটু ময়লা থাকলেই মুঞ্চিল। গরমীতে পচেই মর, আর যাই হক্, দস্তানা পরে যেতেই হবে, নইলে রাস্তায় হাত ময়লা হয় এবং সে হাত কোন জীলোকের হাতে দিয়ে সম্ভাষণ করাটা অতি অভদ্রতা। ভদ্রসমাজে থুথু-ফেলা বা কুলকুচো করা বা দাঁত খোঁটা ইত্যাদি করলে তৎক্ষণাৎ চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি !!

ধর্ম এদের শক্তিপূজা, আধা বামাচার রকমের ; পঞ্চ ম-কারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে। বামে

পাশ্চাত্য ধর্ম
শক্তিপূজা

বামা*** দক্ষিণে পানপাত্র*** অগ্রে
শ্রুতং মরীচসহিতং শূকরস্ত্রোক্ষমাংসং***

কৌলো ধর্মঃ পরমগহনো যোগীনাং মপা-
গম্যঃ।* প্রকাশ্য, সর্বসাধারণ, শক্তিপূজা বামাচার,—
মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেষ্ট্যান্ট ত ইয়োরোপে নগণ্য—
ধর্ম ত কাথলিক। সে ধর্মে জিহোবা, যীশু, ত্রিমূর্তি,
সব অন্তর্দীন, জেগে বসেছেন ‘মা’। শিশু-যীশু-কোলে
‘মা’। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে, অট্টালিকায়,
বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে ‘মা’ ‘মা’ ‘মা’।
বাদসা ডাক্ছে ‘মা’, জঙ্গবাহাদুর (Field-martial)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সেনাপতি ডাক্ছে ‘মা’, ধ্বজা-হস্তে সৈনিক ডাক্ছে ‘মা’, পোতবক্ষে নাবিক ডাক্ছে ‘মা’, জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাক্ছে ‘মা’, রাস্তার কোণে ভিখারী ডাক্ছে ‘মা’। ‘ধন্য মেরী’, ‘ধন্য মেরী’ দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।

আর মেয়ের পূজা। এ শক্তিপূজা কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তিপূজা কুমারী সধবা পূজো, আমাদের দেশে কালী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়—সেই শক্তিপূজা। তবে আমাদের পূজো ঐ তীর্থস্থানেই, সেই ক্ষণমাত্র; এদের দিনরাত, বারমাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চ স্থান, আদর, খাতির। এ যে-সে স্ত্রীলোকের পূজো, চেনা অচেনার পূজো, ভদ্রকুলের ত কথাই নাই, রূপসী যুবতীর ত কথাই নাই। এ পূজো ইয়োরোপে আরম্ভ করে মূরেরা, মুসলমান আরবমিশ্র-মূরেরা যখন তারা স্পেন বিজয় করে আট শতাব্দী রাজত্ব করে, সেই সময়। তাদের থেকে ইয়োরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তিপূজার অভ্যুদয়। মূর ভুলে গেল, শক্তিহীন খ্রীহীন হল। স্বস্থানচ্যুত হয়ে আফ্রিকা কোণে অসভ্যপ্রায় হয়ে বাস করতে লাগলো, আর সে শক্তির সঞ্চার হলো ইয়োরোপে, ‘মা’ মুসলমানকে ছেড়ে উঠলেন কৃষ্ণচানের ঘরে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

এ ইয়োরোপ কি ? কালো, আদ্যকালো, হলুদে, লাল, আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার সমস্ত মানুষ এদের পদানত কেন ? এরা কেনই বা এ কলিযুগের একাধিপতি ?

এ ইয়োরোপ বুঝতে গেলে, পাশ্চাত্যধর্মের আকর ফ্রাঁস—পারি ফ্রাঁস থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইয়োরোপে, ইয়োরোপের মহা-কেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা রীতিনীতি আলোক-আঁধার ভাল-মন্দ সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব—এইখানে এই পারি নগরীতে।

এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি, মুক্তা, প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর-কুম্ভীরও অনেক। এই ফ্রাঁস ইয়োরোপের কর্মক্ষেত্র। সুন্দর দেশ—চীনের কতক অংশ ছাড়া, এমন দেশ—আর কোথাও নেই। নাতিশীতোষ্ণ, অতি উর্বরা, অতিবৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টিও নাই, সে নির্মল আকাশ, মিঠে রোজ, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাহাড়, চিনার বাঁশ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট প্রস্রবণ। সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উদ্ভ্রততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্য্যপ্রিয়। আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনি-দরিদ্র, তাদের ঘর-দোর, ক্ষেত-ময়দান, ঘসে-মেজে, সাজিয়ে-

গুহিয়ে ছবিখানি করে রাখছে। এক জাপান ছাড়া, এ ভাব আর কোথাও নাই। সে ইন্দ্রভূবন, অট্টালিকাপুঞ্জ, নন্দনকানন, উদ্যান, উপবন—মায় চাষার ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ, একটু সুচ্ছবি দেখবার চেষ্টা,—এবং সফলও হয়েছে। এই ফ্রাঁস প্রাচীন হতে গোলওয়া (Gaulois), রোমক ফ্রাঁ (Franks) প্রভৃতি জাতির সংঘর্ষভূমি; এই ফ্রাঁ জাতি রোম-সাম্রাজ্যের বিনাশের পর ইয়োরোপে একাধিপত্য লাভ করলে, এদের বাদসা শার্লমাঞন ইয়োরোপে কৃশ্চান ধর্ম তলওয়ারের দাপটে চালিয়ে দিলেন, এই ফ্রাঁ জাতি হতেই আসিয়াখণ্ডে ইয়োরোপের প্রচার,—তাই আজও ইয়োরোপী আমাদের কাছে ফ্রাঁকি, ফেরিজি, প্লাঁকি, ফিলিজি, ইত্যাদি।

সভ্যতার আকর প্রাচীন গ্রীক ডুবে গেল, রাজচক্র-বর্তী রোম বর্বর আক্রমণ-তরঙ্গে তলিয়ে গেল। ইয়োরোপের আলো নিবে গেল, এদিকে আর এক অতি-বর্বরজাতির আসিয়াখণ্ডে প্রাধুর্ভাব হল—আরব জাতি। মহাবেগে সে আরব-তরঙ্গ পৃথিবী ছাইতে লাগল! মহাবল পারস্ত আরবের পদানত হল, মুসল-মান ধর্ম গ্রহণ করতে হল, কিন্তু তার ফলে মুসলমান

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ধর্ম আর এক রূপ ধারণ করলে ; সে আরবি-ধর্ম আর পারসিক সভ্যতা সম্মিলিত হলো ।

আরবের তলওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারস্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল । সে পারস্য সভ্যতা প্রাচীন গ্রীস ও ভারতবর্ষ হতে নেওয়া । পূর্ব পশ্চিম, হৃদিক্ হতে মহাবলে মুসলমান তরঙ্গ ইয়োরোপের উপর আঘাত করলে, সঙ্গে সঙ্গে বর্বর অন্ধ ইয়োরোপে জ্ঞানালোক ছড়িয়ে পড়তে লাগলো । প্রাচীন গ্রীকদের বিজ্ঞা বুদ্ধি শিল্প বর্বরাক্রান্ত ইতালিতে প্রবেশ করলে, ধরা-রাজধানী রোমের মৃতশরীরে প্রাণস্পন্দন হতে লাগলো—সে স্পন্দন ফ্লরেন্স নগরীতে প্রবল রূপ ধারণ করলে, প্রাচীন ইতালি নব-জীবনে বেঁচে উঠতে লাগলো,—এর নাম রেনেসাঁ (Renaissance) নব-জন্ম । কিন্তু সে নবজন্ম হলো ইতালির । ইয়োরোপের অগ্ন্যাশ্রু অংশের তখন প্রথম জন্ম । সে কৃষ্ণানী ষোড়শ শতাব্দীতে যখন আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান প্রভৃতি মোগল সম্রাট ভারতে মহাবল সাম্রাজ্য তুলেছেন, সেই সময় ইয়োরোপের জন্ম হল ।

ইতালি বুড়ো জাত, একবার সাড়াশব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে গুলো । সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু, আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বিজ্ঞা-বুদ্ধি-শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বুদ্ধ জাত, নানা কারণে আবার পাশ ফিরে গুলে।

ইয়োরোপে, ইতালির-পুনর্জন্ম গিয়ে লাগলো বলবান্, অভিনব নূতন ফ্রাঁ জাতিতে। চারিদিক্ হতে সভ্যতার ধারা সব এসে ফ্লোরেন্স নগরীতে একত্র হয়ে নূতন রূপ ধারণ করলে; কিন্তু ইতালি জাতিতে সে বীৰ্য্য-ধারণের শক্তি ছিল না, ভারতের মত সে উন্মেষ ঐখানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু ইয়োরোপের সৌভাগ্য, এই নূতন ফ্রাঁ জাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ করলে। নবীন-রক্ত, নবীন জাত—সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজের তরঙ্গী ভাসিয়ে দিলে, সে স্রোতের বেগ ক্রমশঃই বাড়তে লাগলো, সে এক ধারা শতধারা হয়ে বাড়তে লাগলো; ইয়োরোপের আর আর জাতি লোলুপ হয়ে খাল কেটে সে জল আপনার আপনার দেশে নিয়ে গেল এবং তাতে নিজেদের জীবনীশক্তি ঢেলে দেওয়ায় তার বেগ, তার বিস্তার বাড়তে লাগলো ভারতে এসে সে তরঙ্গ লাগলো; জাপান সে বহুয়ায় বেঁচে উঠলো, সে জল পান করে মত্ত হয়ে উঠলো; জাপান আসিয়ার নূতন জাত।

এই পারি নগরী—সে ইয়োরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সদানন্দনগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ না লগুনে না বার্লিনে, না আর কোথায়। লগুনে নিউইয়র্কে ধন আছে ; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট ; নেই সে ফরাসি মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসি মানুষ। ধন থাক্, বিদ্যাবুদ্ধি থাক্, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও থাক্—মানুষ কোথায় ? এ অমৃত ফরাসি চরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছাব্লা আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসি মুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।

এই পারি বিশ্ববিদ্যালয় ইয়োরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞান-সভা এদের একাডেমীর নকল ; এই পারি ঔপনিবেশ-সাম্রাজ্যের গুরু, সকল ভাষাতেই যুদ্ধশিল্পের সংজ্ঞা এখনও অধিকাংশ ফরাসি ; এদের রচনার নকল, সকল ইয়োরোপী ভাষায় ; দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের এই পারি খনি, সকল জায়গায় এদের নকল।

এরা হচ্ছে সহরে, আর সব জাত যেন পাঁড়ার্গোয়ে। এরা যা করে, তা ৫০ বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জার্মান ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায় হক্, বা শিল্পে হক্, বা সমাজনীতিতেই হক্। এই ফরাসি সভ্যতা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

স্কটল্যাণ্ডে লাগলো, স্কট্রাজ ইংলণ্ডের রাজা হলেন, ফরাসি সভ্যতা ইংলণ্ডকে জাগিয়ে তুললে ;—স্কট্রাজ ষ্টুয়ার্ট বংশের সময় ইংলণ্ডে রয়াল সোসাইটি প্রভৃতির সৃষ্টি ।

আর এই ফ্রাঁস স্বাধীনতার আবাস । প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারিনগরী হতে ইয়োরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে, সেই দিন হতে ইয়োরোপের নূতন মূর্তি হয়েছে । সে ‘এগালিতে লিবার্ভে ফ্রাভের্নিতে’র (*Egalite liberte fraternite*)—ধ্বনি ফ্রাঁস হতে চলে গেছে ; ফ্রাঁস অন্ত্যভাব, অন্ত্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইয়োরোপের অন্ত্যান্ত জাত এখনও সেই ফরাসি-বিপ্লব মগ্ন করছে ।

একজন স্কটল্যাণ্ডদেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমায় সেদিন বল্লেন যে, পারি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র ; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে । কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত সত্য ; কিন্তু এ কথাটাও সত্য যে, যদি কারু কোনও নূতন ভাব এ জগৎকে দেবার থাকে ত এই পারি হচ্ছে সে প্রচারের স্থান । এই পারিতে যদি ধ্বনি ওঠে ত ইয়োরোপ অবশ্যই প্রতিধ্বনি করবে । ভাস্কর চিত্রকর

গাইয়ে নর্তকী এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে, আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠা হয়।

আমাদের দেশে এই পারি নগরীর বদনামই শুন্তে পাওয়া যায়,—এ পারি মহাকদর্য্য বেশ্যাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য এ কথা ইংরেজেরাই বলে থাকে, এবং অন্য দেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব, তারা অবশ্য বিলাসময় জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারিই দেখে !

কিন্তু লণ্ডন বার্লিন ভিয়েনা নিউইয়র্কও ঐ বার-বনিতাপূর্ণ ভোগে উদ্যোগপূর্ণ; তবে তফাৎ এই যে, অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, পারিসের, সভ্য পারির ময়লা সোণার পাত মোড়া; বুনোশোরের পাঁকে লোটা আর ময়ূরের পেখম-ধরা নাচে যে তফাৎ, অগ্ন্যাগ্ন্য সহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ পারির বিলাসের সেই তফাৎ।

ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা কোন্ জাতে নেই বল ? নইলে ছনিয়ায় যার ছপয়সা হয়, সে অমনি পারি নগরী অভিমুখে ছোট্ট কেন ? রাজা বাদসারা চুপিসাড়ে নাম ভাঁড়িয়ে এ বিলাস-বিবর্তে স্নান করে পবিত্র হতে আসেন কেন ? ইচ্ছা—সর্বদেশে, উদ্যোগের

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

কুটি কোথাও কম দেখি না ; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌঁছেচে ।

তাও অধিকাংশ কদর্যা নাচ-তামাসা বিদেশীর জন্ত, ফরাসী বড় সাবধান, বাজে খরচ করে না । এই ঘোর বিলাস, এই সব হোটেল, ক্যাপে—যাতে একবার খেলে সর্ব্বশাস্ত্র হতে হয়, এ সব বিদেশী আহাম্মক ধনীদেব জন্ত । ফরাসীরা বড় সুসভ্য, আদব-কায়দা বেজায়, খাতির খুব করে, পয়সাগুলি সব বার করে নেয়, আর মুচ্কে মুচ্কে হাসে ।

তা ছাড়া, আর এক তামাসা এই যে, আমেরিক, জার্মান, ইংরেজ প্রভৃতির খোলা সমাজ, বিদেশী ঝাঁ করে সব দেখতে শুন্তে পায় । দু-চার দিনের আলাপেই আমেরিক বাড়ীতে দশ-দিন বাস করবার নিমন্ত্রণ করে ; জার্মান তজপ ; ইংরেজ একটু বিলম্ব । ফরাসী এ বিষয়ে বড় তফাৎ, পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত না হলে, আর বাস করতে নিমন্ত্রণ করে না । কিন্তু যখন বিদেশী ঐ প্রকার সুবিধা পায়, ফরাসি-পরিবার দেখবার জান্‌বার অবকাশ পায়, তখন আর এক ধারণা হয় । বলি, মেছবাজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে—

সেটা কেমন আহাম্মকি ? তেমনি এ পারি। অবিবাহিতা মেয়ে এদেশে আমাদের দেশের মত সুরক্ষিতা, তারা সমাজে প্রায় মিশিতে পায় না। বের পরে তবে নিজের স্বামীর সঙ্গে সমাজে মেশে ; বে-থা মায়ে-বাপে দেয়— আমাদের মত। আর এরা আমোদপ্রিয়, কোনও বড় সামাজিক ব্যাপার নর্তকীর নাচ না হলে সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমাদের বে, পুজো সর্বত্র নর্তকীর আগমন। ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ, ওদের মতে এ বড় অল্লীল, কিন্তু থিয়েটারে হলে আর দোষ নেই। একথাটাও বলি যে, এদের নাচটা আমাদের চোখে অল্লীল বটে, তবে এদের সয়ে গেছে। নেংটি নাচ সর্বত্র, ও গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ আমেরিক দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।

স্ত্রী-সম্বন্ধী আচার পৃথিবীর সর্বদেশেই একরূপ অর্থাৎ পুরুষ মানুষের অণু স্ত্রীসংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় মুন্সিল। তবে

স্ত্রী-সম্বন্ধী
আচার

ফরাসী পুরুষ একটু খোলা, অণু দেশের ধনী লোকেরা যেমন এ সম্বন্ধে বেপরোয়া, তেমনি। আর ইয়োরোপী পুরুষ সাধারণ ওবিষয়টা অত দোষের ভাবে না। অবিবাহিতের ওবিষয়ে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

পাশ্চাত্যদেশে বড় দোষের নয় ; বরং বিদ্যার্থী যুবক ওবিষয়ে একান্ত বিরত থাকলে অনেক স্থলে তার মা-বাপ দোষাবহ বিবেচনা করে ; পাছে ছেলেটা ‘মেনিমুখো’ হয়। পুরুষের একগুণ পাশ্চাত্যদেশে চাই—সাহস ; এদের ‘ভার্চু’ (virtue) শব্দ আর আমাদের ‘বীরত্ব’ একই শব্দ। ঐ শব্দের ইতিহাসেই দেখ, এরা কাকে পুরুষের সত্যতা বলে। মেয়ে মানুষের পক্ষে সতীত্ব অত্যাবশ্যক বটে।

এ সকল কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির এক একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেই-খানটা হতে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুই ভুল।

আমাদের উদ্দেশ্য এ বিষয়ে এদের ঠিক উল্টো, আমাদের ব্রহ্মচারী (বিদ্যার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজিৎ একই কথা।

আমাদের উদ্দেশ্য—মোক্ষ। ব্রহ্মচর্যা বিনা তা কেমনে হয়, বল ? এদের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্যের আবশ্যক তত নাই ; তবে জ্বীলোকের সতীত্ব নাশ হলে ছেলে-পিলে জন্মায় না এবং সমগ্র জাতির ধ্বংস।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

পুরুষ-মামুষে দশ গুণা বে করলে তত ক্ষতি নাই, বরং বংশ বৃদ্ধি খুব হয়। জ্বীলোকের একটা ছাড়া আর একটা এক সঙ্গে চলে না—ফল বন্ধায। কাজেই সকল দেশে জ্বীলোকের সতীত্বের উপর বিশেষ আগ্রহ, পুরুষের বাড়ার ভাগ। ‘প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।’*

যাক্, মোদ্দা এমন সহর আর এ ভূমণ্ডলে নাই। পূর্বকালে এ সহর ছিল আর একরূপ, ঠিক আমাদের কাশীর বাঙ্গালিটোলার মত। অঁকা-বাঁকা গলি রাস্তা, মাঝেমাঝে ছোটো বাড়ী এক-করা খিলান, দেলের গায়ে পাতকো, ইত্যাদি। এবারকার একজিবিশনে একটা ছোট পুরাণ পারি তৈরী করে দেখিয়েছে। সে পারি কোথায় গেছে, ক্রমিক বদলেছে, এক একবার লড়াই-বিদ্রোহ হয়েছে কতক অংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, আবার পরিষ্কার নূতন ফরদা পারি সেই স্থানে উঠেছে।

বর্তমান পারি অধিকাংশই তৃতীয় আঁপোলেঅঁর তৈরী। তৃ-আঁপোলেঅঁ মেরে-কেটে জুলুম করে বাদসা হলেন। ফরাসি সেই প্রথম বিপ্লব হওয়া অবধি সতত টলমল; কাজেই বাদসা, প্রজাদের খুসী রাখবার জন্য,

* গীতা ৩।৩৩

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আর পারি-নগরীর সতত চঞ্চল গরীব লোকদের কাজ দিয়ে খুলী করবার জন্য, ক্রমাগত রাস্তা ঘাট তোরণ থিয়েটার প্রভৃতি গড়তে লাগলেন। অবশ্য, পারির সমস্ত পুরাতন মন্দির তোরণ স্তম্ভ প্রভৃতি রৈল। রাস্তা ঘাট সব নূতন হয়ে গেল। পুরাণ সহর—পগার পাঁচিল সব ভেঙ্গে বুলভারের অভ্যুদয় হতে লাগলো এবং তা হতেই এ সহরের সর্বোত্তম রাস্তা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শাঁজেলিজে রাস্তা তৈরী হল। এ রাস্তা এত বড় চওড়া যে মধ্যখানে এবং ছুপাশ দিয়ে বাগান চলেছে এবং একস্থানে অতি বৃহৎ গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার নাম প্লাস দ লা কনকর্দ, (Place de la concorde)। এই প্লাস দ লা কনকর্দের চারিদিকে প্রায় সমান্তরালে ফ্রাঁসের প্রত্যেক জেলার এক এক যান্ত্রিক নারীমূর্তি। তার মধ্যে একটি মূর্তি হচ্ছে ষ্ট্রাস-বুর্গ নামক জেলার। ঐ জেলা এখন উইট্ (জার্মান)-রা ১৮৭২ সালের লড়াইয়ের পর হতে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সে ছুংখ ফ্রাঁসের আজও যায় না, সে-মূর্তি দিন-রাত প্রেতোদ্বিষ্ট ফুলমালায় ঢাকা। যে রকমের মালা লোকে আত্মীয়-স্বজনের গোরের ওপর দিয়ে আসে, সেই রকম বৃহৎ বৃহৎ মালা দিন-রাত সে মূর্তির উপর কেউ না কেউ দিয়ে যাচ্ছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দিল্লীর চাঁদনিচৌক কতক অংশে এই প্লাস্ দ লা কনকর্দে'র মত এককালে ছিল বলে বোধ হয়। স্থানে স্থানে জয়ন্তস্ত্র বিজয়-তোরণ আর বিরাট নরনারী সিংহাদি ভাস্কর্য্য মূর্তি। মহাবীর প্রথম স্ত্রাপোলেঅঁর স্মারক এক সুবৃহৎ ধাতুনির্ম্মিত বিজয়স্তম্ভ। তার গায়ে স্ত্রাপোলেঅঁর সময়ের যুদ্ধ-বিজয় অঙ্কিত। ওপরে তাঁর মূর্তি। আর একস্থানে প্রাচীন দুর্গ বাস্তিল (Bastille) ধ্বংসের স্মারক-চিহ্ন। তখন রাজাদের একাধিপত্য ছিল, যাকে-তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিত। বিচার না, কিছু না, রাজা এক হুকুম লিখে দিতেন ; তার নাম লেটর দ ক্যাশে—মানে, রাজমুদ্রাক্রিত লিপি। তারপর সে ব্যক্তি আর কি করেছে কি না, দোষী কি নির্দোষ, তার আর জিজ্ঞাসা-পড়া নেই, একেবারে নিয়ে পুরলে সেই বাস্তিলে ;—সেখান থেকে বড় কেউ আর বেরুত না। রাজাদের প্রণয়িনীরা কারুর উপর চট্লে, রাজার কাছ থেকে ঐ শীলটা করিয়ে নিয়ে সে ব্যক্তিকে বাস্তিলে ঠেলে দিত। পরে যখন দেশশুদ্ধ লোক এ সব অত্যাচারে ক্ষেপে উঠলো, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সব সমান, ছোট বড় কিছুই নয়, এ ধ্বনি উঠল, পারির লোক উন্মত্ত হয়ে রাজারাগীকে আক্রমণ করলে, সে সময় প্রথমেই এ মানুষের অত্যাচারের ঘোর নিদর্শন বাস্তিল

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ভূমিসাৎ করলে, সে স্থানটায় এক রাত ধরে নাচগান আমোদ করলে। তারপর রাজা পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ধরে ফেললে, রাজার শ্বশুর অষ্ট্রিয়ার বাদসা জামায়ের সাহায্যে সৈন্য পাঠাচ্ছেন শুনে, প্রজারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে রাজারাবীকে মেরে ফেললে, দেশশুদ্ধ লোকে ‘স্বাধীনতা সামোর’ নামে মেতে উঠলো, ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল, অভিজাত ব্যক্তির মধ্যে যাকে ধরতে পারলে তাকেই মেরে ফেললে, কেউ কেউ উপাধি-টুপাধি ছেড়ে প্রজার দলে মিশে গেল। শুধু তাই নয়, বললে ‘হুনিয়া শুদ্ধ লোক তোমরা ওঠ, রাজা-ফাজা অত্যাচারী সব মেরে ফেল, সব প্রজা স্বাধীন হক্, সকলে সমান হক্!’ তখন ইয়োরোপ শুদ্ধ রাজারা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলো—এ আগুন পাছে নিজেদের দেশে লাগে, পাছে নিজেদের সিংহাসন গড়িয়ে পড়ে যায়, তাই তাকে নেবাবার জন্ত বন্ধপরিকর হয়ে চারিদিক্ থেকে ফ্রাঁস আক্রমণ করলে। এদিকে প্রজাতন্ত্রের কর্তৃপক্ষেরা ‘লা পাত্রি আ দাঁজে’—‘জন্মভূমি বিপদে,’ এই ঘোষণা করে দিলে ; সে ঘোষণা আগুনের মত দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। ছেলেবুড়ো, মেয়ে-মন্দে ‘মার্সাইএ’ মহাগীত গাইতে গাইতে,—উৎসাহপূর্ণ ফ্রাঁসের মহাগীত গাইতে গাইতে, দলে দলে, জীর্ণবসন,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সে শীতে নগ্নপদ, অত্যন্ত ফরাসি প্রজাফোজ বিরাট সমগ্র ইয়োরোপীয় চম্বর সম্মুখীন হল, বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র সব বন্দুক ঘাড়ে বেরুল—‘পরিত্রাণায়... বিনাশায় চ হুঙ্কতাং’* বেরুল। সমগ্র ইয়োরোপ সে বেগ সহ্য করতে পারলে না! ফরাসি জাতির অগ্রে সৈন্যদের স্বন্ধে দাঁড়িয়ে এক বীর,—তঁার অঙ্গুলি-হেলনে ধরা কাঁপতে লাগল, তিনিই গ্রাপোলেঅঁ।

স্বাধীনতা সাম্য ভ্রাতৃত্ব, বন্দুকের নালমুখে তল-ওয়ারের ধারে ইয়োরোপের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়ে দিলে, তিন-রঙা ককার্ডের জয় হল। তারপর, গ্রাপোলেঅঁ ফ্রাঁস মহারাজ্যকে দৃঢ়বদ্ধ সাবয়ব করবার জন্ত বাদসা হলেন। তারপর তাঁর কার্য শেষ হল, ছেলে হলনা বলে সুখ-দুখের সঙ্গিনী ভাগ্যলক্ষ্মী রাজ্ঞী জোসেফিন্কে ত্যাগ করলেন, অষ্ট্রিয়ার বাদসার মেয়ে বে করলেন। জোসেফিনের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাগ্য ফিরল, ক্রম জয় কর্তে গিয়ে বরফে তাঁর ফোঁজ মারা গেল। ইউরোপ বাগ্ পেয়ে তাঁকে জোর করে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে একটা দ্বীপে পাঠিয়ে দিলে, পুরাণ রাজার বংশের একজনকে তাকে বসালে।

মরা সিঙ্গী সে দ্বীপে থেকে পালিয়ে আবার ফ্রাঁসে

* গীতা ৪৮

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

হাজির হল, ফ্রাঁসশুদ্ধ লোক আবার তাঁকে মাথায় করে নিলে, রাজা পালাল। কিন্তু অদৃষ্ট ভেঙ্গেছে, আর জুড়লনা—আবার ইয়োরোপ শুদ্ধ পড়ে, তাঁকে হারিয়ে দিলে, গ্রাপোলেঅ ইংরেজদের এক জাহাজে উঠে শরণাগত হলেন ; ইংরেজেরা তাঁকে সেন্ট হেলেনা নামক দূর একটা দ্বীপে বন্দী রাখলে—আমরণ। আবার পুরাণ রাজা এল, তার ভাইপো রাজা হল। আবার ফ্রাঁসের লোক ক্ষেপে উঠলো রাজা-ফাজা তাড়িয়ে দিলে, আবার প্রজাতন্ত্র হল। মহাবীর গ্রাপোলেঅ'র এক ভাইপো এ সময়ে ক্রমে ফ্রাঁসের প্রীতিপাত্র হলেন, ক্রমে একদিন ষড়যন্ত্র করে নিজেকে বাদশা ঘোষণা করলেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় গ্রাপোলেঅ' ; দিন কতক তাঁর খুব প্রতাপ হল। কিন্তু জর্মান যুদ্ধে হেরে তাঁর সিংহাসন গেল, আবার ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল। সেই অবধি প্রজাতন্ত্র চলেছে।

| | |
|---|--|
| যে পরিণামবাদ ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের | মূলভিত্তি, এখন সে পরিণাম-বাদ ইয়ো- |
| ভারতীয় সকল | রোপীয় বহির্বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে। |
| সম্প্রদায়ের | |
| মূলভিত্তিবিশ্রুপ | ভারত ছাড়া অশ্রুত সকল দেশের ধর্ম্মে |
| পরিণামবাদ | ছিল এই যে, হুনিয়াটা সব টুকুরো টুকুরো, |
| —Evolution | আলাদা আলাদা। ঈশ্বর একজন আলাদা, |
| Theory. | |

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

প্রকৃতি একটা আলাদা, মানুষ একটা আলাদা, ঐ রকম পশু পক্ষী কীট-পতঙ্গ গাছ-পালা মাটি পাথর ধাতু প্রভৃতি সব আলাদা আলাদা। ভগবান্ ঐ রকম আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন।

জ্ঞান মানে কিনা বজ্র মধ্যে এক দেখা। যে গুলো আলাদা, তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধে এই ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে ‘নিয়ম’ বলে, এরি নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

পূর্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল; ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে, মাটি পাথর গাছ পালা জন্তু মানুষ দেবতা, এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং—এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে। অদ্বৈতবাদী এর চরম-সীমায় পৌঁছুলেন, বললেন যে, সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক, তার নাম ‘ব্রহ্ম’; আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, পর নাম দিলেন ‘মায়া’, ‘অবিদ্যা’ অর্থাৎ অজ্ঞান। এই হল জ্ঞানের চরম সীমা।

ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দাও, বিদেশে যদি এ কথাটা এখন কেউ বুঝতে না পারে, ত তাকে আর পণ্ডিত কি করে বলি। মোদ্দা, এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে, এদের রকম দিয়ে,—জড়-বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে। তা সে ‘এক’ কেমন করে ‘বহু’ হল, এ কথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি যে, ওখানটা বুদ্ধির অতীত। এরাও তাই করেছে। তবেই সে ‘এক’ কি কি রকম হয়েছে, কি কি রকম জাতিত্ব ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এইটার খোঁজের নাম বিজ্ঞান (Science)।

কাজেই এখন এদেশে প্রায় সকলেই পরিণামবাদী, —Evolutionist. যেমন ছোট জানোয়ার বদলে বদলে বড় জানোয়ার হচ্ছে, বড় জানোয়ার কখন কখন ছোট হচ্ছে, লোপ পাচ্ছে ; তেমনি মানুষ যে একটা সুসভ্য অবস্থায় ছুন্ করে জন্ম পেলে, এ কথা আর কেউ বড় বিশ্বাস করছে না। বিশেষ এদের বাপ্-

দাদা, কাল্ না পরশু, বর্কবর ছিল, তা থেকে অল্প দিনে এই কাণ্ড। কাজেই এরা বলছে, যে সমস্ত মানুষ ক্রমে ক্রমে অসভ্য অবস্থা থেকে উঠেছে এবং উঠছে। আদিম

পাশ্চাত্য মতে
সমাজের
ক্রমবিকাশ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

মানুষ কাঠ-পাথরের যন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে কাজ চালাত, চামড়া বা পাতা পরে দিন কাটাত, পাহাড়ের গুহায় বা পাখীর বাসার মত কুঁড়ে ঘরে গুজরান্ করত। এর নিদর্শন সর্বদেশের মাটির নীচে পাওয়া যাচ্ছে এবং কোনও কোনও স্থলে সে অবস্থার মানুষ স্বয়ং বর্তমান। ক্রমে মানুষ ধাতু ব্যবহার করতে শিখলে, সে নরমধাতু—টিন আর তামা। তাকে মিশিয়ে যন্ত্রতন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র করতে শিখলে। প্রাচীন গ্রীক বাবিল মিশরীরাও অনেক দিন পর্য্যন্ত লোহার ব্যবহার জানত না, যখন তারা অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়েছিল, বই-পত্র পর্য্যন্ত লিখত, সোণা-রূপো ব্যবহার করত তখন পর্য্যন্ত। আমেরিকা মহাদ্বীপের আদিম-নিবাসীদের মধ্যে মেক্সিকো পেরু মায়া প্রভৃতি জাতি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করত, সোণা-রূপোর খুব ব্যবহার ছিল (এমন কি ঐ সোণা-রূপোর লোভেই স্প্যানি লোকেরা তাদের ধ্বংস সাধন করলে)। কিন্তু সে সমস্ত কাজ চক্ৰমকি পাথরের অস্ত্রদ্বারা অনেক পরিশ্রমে করতো, লোহার নাম গন্ধও জানতো না।

আদিম অবস্থায় মানুষ তীর ধনুক বা জালাদি উপায়ে জন্তু, জানোয়ার, মাছ মেরে খেত, ক্রমে চাষ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বাস শিখলে, পশুপালন করতে শিখলে। বনের
আদিম অব-
হার মানুষ
মৃগয়াজীবী
জানোয়ারকে বশে এনে নিজের কাজ
করাতে লাগলো। অথবা সময়মত আহা-
রেরও জন্য জানোয়ার পালতে লাগলো।
গরু, ঘোড়া, শূকর, হাতি, ঊট, ভেড়া, ছাগল, মুরগি
প্রভৃতি পশুপক্ষী মানুষের গৃহপালিত হতে লাগলো।
এর মধ্যে কুকুর হচ্ছেন মানুষের আদিম বন্ধু।

আবার চাষবাস আরম্ভ হলো। যে ফল-মূল শাক
সব্জি ধান-চাল মানুষে খায়, তার বুনো অবস্থা আর
এক রকম। এ মানুষের যত্নে বুনো ফল
পরে কৃষিজীবী
বুনো ঘাস, নানাপ্রকার সুখাত্ত বৃহৎ ও
উপাদেয় ফলে পরিণত হলো। প্রকৃতিতে আপনা
আপনি দিনরাত অদল-বদল ত হচ্ছেই। নানাজাতের
বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী শরীরসংসর্গে দেশ-কাল পরিবর্তনে
নবীন নবীন জাতির সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মানুষ-সৃষ্টির
পূর্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতি ধীরে ধীরে তরুলতা, জীবজন্তু
বদলাচ্ছিলেন, মানুষ জন্মে অবধি সে ছড়মুড় করে
বদলে দিতে লাগলো। সাঁ-সাঁ করে একদেশের গাছ-
পালা জীবজন্তু অন্য দেশে মানুষ নিয়ে যেতে লাগলো,
তাদের পরস্পর মিশ্রণে নানাপ্রকার অভিনব জীবজন্তুর,
গাছপালার জাত মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হতে লাগলো।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আদিম অবস্থায় বিবাহ থাকে না, ক্রমে ক্রমে যৌন সম্বন্ধ উপস্থিত হ়ল। প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ সৰ্বসমাজে ‘মা’য়ের উপর ছিল। বাপের বড় ঠিকানা বিবাহের আদিত্ব থাকতো না। মায়ের নামে ছেলে-পুলের নাম হত। ‘মেয়েদেয় হাতে সমস্ত ধন থাকতো ছেলে মানুষ করবার জন্য। ক্রমে ধন-পত্র পুরুষের হাতে গেল, মেয়েরাও পুরুষের হাতে গেল। পুরুষ বলে, যেমন এ ধনধান্য আমার, আমি চাষবাস করে বা লুঠতরাজ করে উপার্জন করেছি, এতে যদি কেউ ভাগ বসায়, ত আমি বিরোধ করবো,’ তেমনি বলে, ‘এ মেয়েগুলো আমার, এতে যদি কেউ হস্তার্পণ করে ত বিরোধ হবে।’ বর্তমান বিবাহের সূত্রপাত হলো। মেয়ে মানুষ, পুরুষের ঘটি বাটি গোলাম প্রভৃতি অধিকারের স্থায় হলো। প্রাচীন রীতি—একদলের পুরুষ অশ্বদলে বে করত। সে বিবাহও জ্বরদস্তি—মেয়ে ছিনিয়ে এনে। ক্রমে সে কাড়াকাড়ি বদলে গেল, স্বেচ্ছায় বিবাহ চললো; কিন্তু সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস থাকে। এখনও প্রায় সৰ্বদেশে বরকে একটা নকল আক্রমণ করে! বাঙ্গালাদেশে, ইউরোপে, চাল দিয়ে বরকে আঘাত করে, পশ্চিমাঞ্চলে কনের আত্মীয়-মেয়েরা বরযাত্রিকে গালিগালাজ করে, ইত্যাদি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সমাজ সৃষ্টি হতে লাগল। দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করত, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত; যারা সমতল জমিতে, তাদের চাষবাস; যারা পার্বত্যদেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময়দেশে, তারা ছাগল উট চরাতে লাগলো। কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে শীকার করে খেতে লাগলো। যারা সমতল দেশ পেলে, চাষ-
 কৃষিকারী দেব বাস শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা
 ও যুগযুগাবধি নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে,
 অহরের সম্বন্ধ তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগলো। কিন্তু
 সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্বল হতে লাগলো।
 যাদের শরীর দিনরাত খোলা হাওয়ায় বাস করে, মাংস-
 প্রধান আহার—তাদের, আর যারা ঘরের মধ্যে বাস
 করে, শস্যপ্রধান আহার, অনেক পার্থক্য হতে লাগলো।
 শিকারী বা পশুপাল বা মৎস্যজীবী আহারে অনটন
 হলেই ডাকাত বা বোম্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুণ্ঠনে
 আরম্ভ করলে। সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য, ঘন-
 দলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগলো, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি
 হতে লাগলো।

দেবতারার ধান চাল খায়, সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম,
 নগর, উদ্যান বাস, পরিধান বোনা কাপড়; আর

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

অশুরদের পাহাড় পর্বত, মরুভূমি বা সমুদ্রতটে বাস, আহার বস্ত্র জানানোয়ার, বস্ত্রফলমূল, পরিধান ছাল ; আর বুনো জিনিষ বা ভেড়া ছাগল গরু দেবতাদের কাছ থেকে, বিনিময়ে যা ধান-চাল। দেবতার শরীর শ্রম সহিতে পারে না, দুর্বল। অশুরের শরীর উপবাস-কুচ্ছ কষ্টসহনে বিলক্ষণ পটু।

অশুরের আহারাভাব হলেই, দল বেধে পাহাড় হতে, সমুদ্রকূল হতে, গ্রাম নগর লুণ্ঠিতে এল। কখনও বা ধন-ধানের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগলো। দেবতারা বহুজন একত্র না হতে পারলেই অশুরের হাতে মৃত্যু ; আর দেবতার বুদ্ধি প্রবল হয়ে নানাপ্রকার যন্ত্র-তন্ত্র নির্মাণ করতে লাগলো। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র—সব দেবতাদের ; অশুরের সাধারণ অস্ত্র, কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারংবার অশুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অশুর সভ্য হতে জানে না। চাষবাস করতে পারে না, বুদ্ধি চালাতে জানে না। বিজয়ী অশুর যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য করতে চায়, ত সে কিছুদিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধিকৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে। নতুবা অশুর লুণ্ঠ করে সরে আপনার স্থানে যায়। দেবতারা যখন একত্রিত হয়ে, অশুরদের তাড়ায়,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

তখন—হয় তাদের সমুদ্র মধ্যে তাড়ায়, না হয় পাহাড়ে, না হয় জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়। 'ক্রমে হু দিকেই দল বাড়তে লাগলো, লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগলো, লক্ষ লক্ষ অশুর একত্র হতে লাগলো। মহা-সংঘর্ষ, মেশামেশি, জেতাজিতি চলতে লাগলো। এ—সব রকমের মানুষ মিলে-মিশে বর্তমান সমাজ, বর্তমান প্রথাসকলের সৃষ্টি হতে লাগলো। নানা রকমে নূতন ভাবের সৃষ্টি হতে লাগলো, নানা বিচার আলোচনা চললো। একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগলো—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই সব ভোগ্যভব্য রক্ষা করতে লাগলো। সকলে মিলে সেই সব বিনিময় করতে লাগলো, আর

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| রাজ্য | মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ জায়গার |
| বর্ণিক শ্রুতি | জিনিষটা ওজায়গায় নিয়ে যাবার বেতন- |
| বিভিন্ন শ্রেণীর | স্বরূপ সমস্ত জিনিষের অধিকাংশ আত্মসাৎ |
| উৎপত্তি- | করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, |
| রহস্য | |

একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম করে কতকটা আগ-ভাগ নিলে; অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দিয়ে মলো !! পাহারাওয়ালার নাম হলো রাজা, মুটের নাম হলো সওদাগর। এ ছুঁ দল কাজ করলে না—কাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিষ তৈরী করতে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে ‘হা ভগবান’ ডাকতে লাগলো।

ক্রমে এই সকল ভাব প্যাঁচাপেঁচি, মহা গেরোর উপর গেরো, তস্মা গেরো হয়ে বর্তমান মহা জটিল সমাজ উপস্থিত হলেন। কিন্তু ছিট মরে না। যে গুলো পূর্ব জন্মে ভেড়া চরাত, মাছ ধরে খেত, সে গুলো সভ্য-জন্মে বন্ধেটে ডাকাত প্রভৃতি হতে লাগলো। বন নেই—যে সে শিকার করে; কাছে পাহাড় পর্বত নেই যে ভেড়া চরায়; জন্মের দরুণ শিকার বা ভেড়া চরান বা মাছ ধরা

দহা ও বেস্তার
উৎপত্তি

কোনটারই সুবিধা পায় না—সে কাজেই ডাকাতী করে, চুরি করে, সে যায় কোথা ? সে প্রাতঃস্মরণীয়াদের কালের মেয়ে, এ জন্মে ত আর এক সঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা। ইত্যাদি রকমের নানা চণ্ডের, নানা ভাবের, নানা সভ্য অসভ্য দেবতা অমুর জন্মের মানুষ একত্র হয়ে—হয়েছে সমাজ। কাজেই সকল সমাজে এই নানারূপে ভগবান্ বিরাজ কচ্ছেন। সাধু নারায়ণ,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ডাকাত নারায়ণ, ইত্যাদি। আবার যে সমাজে যে দলে সংখ্যায় অধিক, সে সমাজের চরিত্র সেই পরিমাণে দৈবী বা আশুরী হতে লাগলো।

জম্বুদ্বীপের তামাম্ সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্বর, ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংচিকিয়ং গঙ্গা সিঙ্কু ইউফ্রেটিসতীর। এ সকল সভ্যতারই আদ্য ভিত্তি চাষবাস। এ সকল সভ্যতাই দেবতাপ্রধান। আর ইউরোপের সকল সভ্যতাই প্রায় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্র-ময় দেশে জন্মেছে—ডাকাত আর বসেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অশুর-ভাব অধিক।

বর্তমান কালে যতদূর বোঝা যায়, জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগ ও আরবের মরুভূমি অশুরদের প্রধান আড্ডা হয়। ঐ স্থান হতে একত্র হয়ে পশুপাল যুগযাজ্ঞবী অশুরকুল, সভ্য দেবতাদের তাড়া দিয়ে, ছুনিয়াময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইউরোপখণ্ডের আদিমনিবাসী এক জাত অবশ্য ছিল। পর্বতগহ্বরে বাস করত; যারা ওর মধ্যে একটু বুদ্ধিমান্ তারা অল্প গভীর তলাওয়ার জলে খোঁটা পুঁতে, মাচান বেঁধে, সেই মাচানের ওপর ঘর-দোর নির্মাণ করে বাস করত। চক্ৰমকি পাথরের তীর,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বর্ষার ফলা, চক্ৰমকির ছুরি ও পরশু দিয়ে সমস্ত কাজ চালাত।

ক্রমে জম্বুদ্বীপের নরশ্রোত ইউরোপের উপর পড়তে লাগলো। কোথাও কোথাও অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতির অভ্যুদয় হলো; রুষাদশাস্ত্রগত কোনও জাতির ভাষা, ভারতের দক্ষিণ ভাষার অনুরূপ।

কিন্তু এ সকল জাত বর্বর, অতি বর্বর অবস্থায় রইল। আসিয়া-মাইনর হতে একদল সুসভ্য মানুষ

সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে উদয় হল, ইউরোপের

সন্নিহিত স্থান অধিকার করলে, নিজদের বুদ্ধি আর প্রাচীন মিসরের সাহায্যে এক অপূর্ব সভ্যতা সৃষ্টি করলে; তাদের আমরা বলি যবন, ইউরোপীয়া বলে ঐক।

পরে ইতালিতে রোমক নামক অন্য এক বর্বর জাতি, ইট্রিস্কান্ নামক অন্য এক সভ্য জাতি, ইউরোপীয়া জাতির সৃষ্টি জাতিকে পরাভূত করে, তাদের বুদ্ধি-বিজ্ঞা সংগ্রহ করে নিজেরা সভ্য হল। ক্রমে রোমকেরা চারিদিক অধিকার করলে; ইউরোপ-খণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের যাবতীয় অসভ্য মানুষ তাদের প্রজা হলো। কেবল উত্তর-ভাগে বনজঙ্গলে বর্বর জাতিরা স্বাধীন রইল। কালবশে রোম ঐশ্বর্য্য-

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বিলাসপরতায় দুর্বল হতে লাগল; সেই সময় আবার জম্বুদ্বীপ অশুরবাহিনী ইউরোপের উপর নিক্ষেপ করলে। অশুর তাড়নায় উত্তর-ইউরোপী বর্বর রোমসাম্রাজ্যের উপর পড়লো! রোম উৎসন্ন হয়ে গেল। জম্বুদ্বীপের তাড়ায় ইউরোপের বর্বর আর ইউরোপের ধ্বংসাবশিষ্ট রোমক-গ্রীক মিলে এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হলো; এ সময় যাহুদীজাতি রোমের দ্বারা বিজিত ও বিতাড়িত হয়ে, ইউরোপময় ছড়িয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নূতন ধর্ম কৃষ্ণানীও ছড়িয়ে পড়লো। এই সকল বিভিন্ন জাত, মত, পথ নানাপ্রকারের অশুরকুল, মহামায়ার মুচিতে, দিবারাত্র যুদ্ধ মারকাটের আগুনে গলে মিশতে লাগলো; তা হতেই এই ইউরোপী জাতের সৃষ্টি।

হিঁদুর কালরঙ থেকে, উত্তরে ছুধের মত সাদা রঙ, কাল, কটা লাল বা সাদা চুল, কাল চোখ, কটা চোখ, নীল চোখ, দিব্যি হিঁদুর মত নাক মুখ চোখ, বা জাতা-মুখো চীনেরাম, এই সকল আকৃতিবিশিষ্ট এক বর্বর, অতি-বর্বর ইউরোপী জাতির সৃষ্টি হয়ে গেল। কিছুকাল তারা আপনা-আপনি মারকাট করতে লাগলো; উত্তরের গুলো বস্বেটেরূপে বাগে পেলেই অপেক্ষাকৃত সভ্যগুলোর উৎসাদন করতে লাগল। মাঝখান থেকে,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

কৃষ্ণান ধর্মের দুই গুরু, ইতালির পোপ্ (ফরাসি, ইতালি ভাষায় বলে 'পাপ') আর পশ্চিমে কনষ্টান্টিনোপলসের পাট্রিয়ার্ক, এরা এই জন্তপ্রায় বর্ষবাহিনীর উপর, তাদের রাজারাণী সকলের উপর কঠান্তি চালাতে লাগল।

এদিকে আবার আরব-মরুভূমে মুসলমানি ধর্মের উদয় হল। বস্তুপশুপ্রায় আরব এক মহাপুরুষের প্রেরণাবলে অদম্য তেজে, অনাহত বলে, পৃথিবীর উপর আঘাত করলে। পশ্চিম-পূর্ব হুপ্রান্ত হতে সে তরঙ্গ ইউরোপে প্রবেশ করলে। সে স্রোত-মুখে ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের বিছাবুন্ধি ইউরোপে প্রবেশ করতে লাগলো।

জম্বুদ্বীপের মাঝখান হতে সেলমুল তাতার নামক অশুর জাতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে আসিয়া-মাইনর প্রভৃতি স্থান দখল করে ফেললে। আরাব্রা ভারতবর্ষ জয়ের অনেক চেষ্টা করেও সফল হয় নি। মুসলমান-অভ্যুদয় সমস্ত পৃথিবী বিজয় করেও ভারতবর্ষের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে গেল। সিন্ধুদেশ একবার আক্রমণ করেছিল মাত্র, কিন্তু রাখতে পারেনি; তারপর থেকে আর উত্তম করে নি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

কয়েক শতাব্দীর পর যখন তুর্ক প্রভৃতি তাতার জাতি বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে মুসলমান হলো, তখন এই তুর্কিরা সমভাবে হিন্দু, পার্শি, আরাব, সকলকে দাস করে ফেললে। ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান বিজেতার মধ্যে একদলও আরবি বা পার্শি নয় সব তুর্কাদি তাতার। রাজপুতানায় সমস্ত আগন্তুক মুসলমানের নাম তুর্ক—তাই সত্য, ঐতিহাসিক। রাজপুতানার চারণ যে গাইলেন, ‘তুরুগগকো বড়ি জোর’, তাই ঠিক। কুতুবউদ্দিন হতে মোগল বাদশাই পর্যন্ত, ও সব তাতার, যে জাত তিব্বতি, সেই জাত; কেবল হয়েছেন মুসলমান, আর হিঁদু পারসি বে করে বদলেছেন, চাকামুখ। ও সেই প্রাচীন অশুর বংশ। আজও কাবুল, পারস্ত, আরব্য, কন্ট্রান্টিনোপোলে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছেন, সেই অশুর তাতার; গান্ধারি, ফার্সি, আবার সেই তুরস্কের গোলামী কচ্ছেন। বিরাট চীনসাম্রাজ্যও সেই তাতার মাঞ্চুর পদতলে, তবে সে মাঞ্চু নিজের ধর্ম ছাড়েনি, মুসলমান হয়নি, মহালামার চেলো। এ অশুর জাত কশ্মিরকালে বিজ্ঞা-বুদ্ধির চর্চা করে না, জানে মাত্র লড়াই। ও রক্ত না মিশলে, যুদ্ধবীৰ্য্য বড় হয় না। উত্তর ইউরোপ, বিশেষ রুষের প্রবল যুদ্ধবীৰ্য্য সেই তাতার। রুষ তিন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

হিস্তে তাতার রক্ত। দেবাসুরের লড়াই এখনও চলবে অনেক কাল। দেবতা অসুরকণ্ঠা বে করে, অসুর দেবকণ্ঠা ছিনিয়ে নেয়,—এই রকম করে প্রবল খিচুড়ি জাতের সৃষ্টি হয়।

তাতাররা আরবি খলিফার সিংহাসন কেড়ে নিলে, কৃশ্চানদের মহাতীর্থ জিরুসালম্ প্রভৃতি স্থান দখল করে কৃশ্চানদের তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দিলে, অনেক কৃশ্চান মেরে ফেললে। কৃশ্চান ধর্ম্মের গুরুরা ক্ষেপে উঠল; ইউরোপময় তাদের সব বর্ষর চেলা; রাজা

প্রজাকে ক্ষেপিয়ে তুললে,—পালে পালে
খ্রীষ্টান মুসল-
মান ধর্ম্ম ইউরোপী বর্ষর জিরুসালম্ উদ্ধারের

জন্তু আসিয়ামাইনরে চললো। কতক নিজেরাই কাটাকাটি করে মলো, কতক রোগে মলো, বাকি মুসলমানে মার্ত্তে লাগলো। সে ঘোর বর্ষর ক্ষেপে উঠেছে,—মুসলমানেরা যত মারে তত আসে। সে বুনোর গৌ। আপনার দলকেই লুঠছে, খাবার না পেলে মুসলমান ধরেই খেয়ে ফেললে। ইংরেজ রাজা রিচার্ড মুসলমান-মাংসে বিশেষ খুসী ছিলেন, প্রসিদ্ধি আছে।

বুনো মানুষ, আর সভ্য মানুষের লড়ায়ে যা হয়, তাই হল,—জিরুসালম্ প্রভৃতি অধিকার করা হলো

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

না। কিন্তু ইউরোপ সভ্য হতে লাগলো। সে
চামড়া পরা, আমমাংস-খেকো বুয়ো ইংরেজ ফরাসি
জার্মান প্রভৃতি আসিয়ার সভ্যতা শিখতে
কলে
ইউরোপে লাগলো! ইতালি প্রভৃতি স্থানের নাগা
সভ্যতার
প্রবেশ ফৌজ দার্শনিক মত শিখতে লাগল;
একদল কৃশ্চান নাগা (Knights-
'Templars') ঘোর অদ্বৈতবেদান্তী হয়ে উঠলো; শেষে
তারা কৃশ্চানীকে ঠাট্টা করতে লাগলো, এবং তাদের
ধনও অনেক সংগৃহীত হয়েছিল; তখন পোপের
হুকুমে, ধর্মরক্ষার ভানে ইউরোপী রাজারা তাদের
নিপাত করে ধন লুণ্ঠে নিলে।

এদিকে মূর নামক মুসলমান জাতি স্পান দেশে
অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন করলে, নানাবিদ্যার চর্চা
করলে, ইউরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হলো;
ইতালি ফ্রান্স, সুদূর ইংলণ্ড হতে বিদ্যার্থী বিদ্যা
শিখতে এলো; রাজা-রাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধবিদ্যা,
আচার, কায়দা, সভ্যতা শিখতে এলো। বাড়ী-ঘর-দোর
মন্দির সব নূতন ঢঙে বনুতে লাগলো।

কিন্তু সমগ্র ইউরোপ হয়ে দাঁড়াল এক মহা সেনা-
নিবাস—সে ভাব এখনও। মুসলমানেরা একটা
দেশ জয় করে, রাজা আপনার এক বড় টুকরা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

রেখে, বাকি সেনাপতিদের বেঁটে দিতেন। তারা
 খাজনা দিত না, কিন্তু রাজার আবশ্যক
 ইউরোপ
 এক মহাসেনা- হলেই—এতগুলি সৈন্য দিতে হবে। এই
 নিবাসে
 পরিণত রকমে সদা প্রস্তুত ফৌজের অনেক
 হাজিমা না রেখে, আবশ্যক-কালে-হাজির
 প্রবল ফৌজ প্রস্তুত রইল। আজও রাজপুতানায়
 সে ভাব কতক আছে;—ওটা মুসলমানেরা এদেশে
 আনে। ইউরোপীরা মুসলমানের এভাব নিলে।
 কিন্তু মুসলমানদের ছিল রাজা সামন্তচক্র, বাকি ফৌজ
 ও প্রজা। ইউরোপে রাজা সামন্তচক্র আর বাকি
 সব প্রজাকে করে ফেললে এক রকম গোলাম।
 প্রত্যেক মানুষ কোনও সামন্তের অধিকৃত মানুষ হয়ে,
 তবে জীবিত রইল—জুম মাত্রই প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধ-
 যাত্রায় হাজির হতে হবে।

ইউরোপী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সব হলো
 উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ
 পাহাড়ী সমুদ্রতটময় প্রদেশ; এর তুলো হচ্ছে—
 ইউরোপী
 সভ্যতা-বস্ত্রের
 উপাদান সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ, নানাজাতের
 মিশ্রণে এক মহা খিচুড়ি জাত। এর
 টানা হচ্ছে—যুদ্ধ; আত্মরক্ষার জন্য, ধর্ম-
 রক্ষার জন্য যুদ্ধ। যে তলওয়ার চালাতে পারে, সে

হয় বড়; যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোনও বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবন ধারণ করে। এর পোড়েন—বাণিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তলওয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহপারলৌকিক ভোগ।

আমাদের কথাটা কি? আর্থ্যারা শান্তিপ্রিয়, চাষ-বাস করে শস্তাদি উৎপন্ন করে, শান্তিতে। পরিবার পালন করতে পেলেই খুসী। তাতে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট; কাজেই চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক। আমাদের জনক রাজা স্বহস্তে লাঙ্গল

আমাদের চালাচ্ছেন এবং সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ
সভ্যতা আশ্রয়িতা তিনি। ঋষি, মুনি, যোগীর
শান্তিপ্রিয় অভ্যাস—গোড়া থেকে; তাঁরা প্রথম
হতেই জেনেছেন যে, সংসারটা ধোঁকা, লড়াই কর,
আর লুটাই কর, ভোগ বোলে যা খুঁজছ, তা আছে
শান্তিতে, শান্তি আছেন শারীরিক ভোগ বিসর্জনে;
ভোগ আছেন মনঃশীলতায়, বুদ্ধি-চর্চায় শরীরচর্চায়
নেই। জঙ্গল আবাদ করা তাদের কাজ।

তারপর, প্রথমে সে পরিস্কৃত ভূমিতে নিশ্চিত হল
যজ্ঞবেদী, উঠলো—সে নির্মল আকাশে যজ্ঞের ধূম, সে
বায়ুতে বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো, গবাদি পশু

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

নিঃশঙ্কে চরতে লাগলো। বিদ্যাধর্মের পায়ের নীচে তলওয়ার রইল! তার একমাত্র কাজ ধর্মরক্ষা করা, মানুষ ও গবাদি পশুর পরিত্যাগ করা, বীরের নাম—আপজাতা, ক্ষত্রিয়।

লাঙ্গল, তলওয়ার সকলের অধিপতি রক্ষক রইলেন, ধর্ম। তিনি রাজার রাজা, জগৎ নিদ্রিত হলেও তিনি সদা জাগরুক। ধর্মের আশ্রয়ে সকলে রইল স্বাধীন।

ঐ যে ইয়োरोपी পণ্ডিত বল্চেন যে, আর্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের বুনোদের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন, ও সব আধাঙ্গণ কড়ুক ভারতীয় আদিম জাতিবিনাশ—ইয়োरोपीদের ভিত্তিহীন অদ্ভুত মন মাত্র

আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ সব বিকল্প মিথ্যা ছেলেপুলেদের শেখান হচ্ছে। এ অতি অশ্রুয়।

আমি মূর্খ মানুষ, যা বুঝি তাই নিয়েই এ পারি-সভায় বিশেষ প্রতিবাদ করেছি। এদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করছি সময় পেলে আরও সংশয় ওঠাবার আশা আছে। এ কথা তোমাদেরও বলি—তোমরা পণ্ডিত-মনিষ্যি—পুঁথি পাতড়া খুঁজে দেখ।

ইয়োरोपीরা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন, অতএব আর্যোরাও তাই করেছে !! ওরা হা-ঘরে ‘হা-অন্ন’ ‘হা-অন্ন’ করে, কাকে লুণ্ঠবে, মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়— আর্যোরাও তাই করেছে !! বলি, এর প্রমাণটা কোথায়—আন্দাজ ? ঘরে তোমার আন্দাজ রাখগেণ

কোন্ বেদে, কোন্ স্মৃতিতে, কোথায় দেখ্ছ যে, আর্যোরা কোন্ বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে ? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন ? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি ? আর রামায়ণ পড়া ত হয় নি,—খামকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানানো ?

রামায়ণ কি-না আর্যদের দক্ষিণ বুনো বিজয় !! বটে—রামচন্দ্র আর্য রাজা সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে ?

লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে । সে রাবণ,

রামায়ণ আর্য-
জাতি কতক
অনার্য বিজয়ের
উপাখ্যান নহে

রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয় । লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল,

বরং কম ত নয়ই । তারপর বানরাদি দক্ষিণ লোক বিজিত হলো কোথায় ? তারা হলো সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র । কোন্ গুহকের কোন্ বালির রাজ্য, রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন— তা বল না ?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

হতে পারে হু এক জায়গায় আর্ঘ্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে হু একটা ধূর্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধূনি জালিয়ে বসেছিল। নটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে, কখন রাক্ষসেরা ঢিল ঢেলা হাড়গোড় ছোঁড়ে। যেমন হাড়গোড় ফেলা, অমনি নাকিকান্না ধরে রাজাদের কাছে গমন। রাজারা লোহার জামাপরা, লোহার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়া চড়ে এলেন; বুনো হাড় পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে? রাজারা মেরে ধরে চলে গেল। এ হতে পারে; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিয়েছে, কোথায় পাচ্ছ?

অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান, সমতল ক্ষেত্র—আর্ঘ্যসভ্যতার তাঁত। আর্ঘ্যপ্রধান, নানাপ্রকার শূসভা, অর্কসভা, অসভা মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার। এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষনিবারণ।

তুমি ইয়োरोপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলাবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ, উপসংহার তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ, তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ,
তোমাদের আফ্রিকা ?

কোথা সে সকল বুনো জাত আজ ? একেবারে
নিপাত,—বন্য পশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ,
—যেখানে তোমাদের শক্তি নাই, সেথা মাত্র অস্ত্র জাত
জীবিত ।

আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন্ কালেও করেন নি ।
আর্য্যোরা অতি দয়াল ছিলেন, তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ
বিশাল হৃদয়ে, অমানব-প্রতিভাসম্পন্ন মাথায়, ওসব
আপাতরমণীয় পাশবপ্রণালী কোনও কালেও স্থান পায়
নি । স্বদেশী আহাম্মক ! যদি আর্য্যরা বুনোদের
মেরে ধরে বাস করত, তা হলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি
কি হত ?

ইয়োরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ কোরে,
আমরা বেঁচে থাক্‌বো । আর্য্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে
আমাদের সমান্ কর্‌বো, আমাদের চেয়ে বড় কর্‌বো ।
ইয়োরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার ; আর্য্যের
উপায়—বর্ণবিভাগ । শিক্ষা, সভ্যতার তারতম্যে
সভ্যতা শেখবার সোপান, বর্ণবিভাগ । ইয়োরোপে
বলবানের জয়, দুর্ব্বলের মৃত্যু ; ভারতবর্ষের প্রত্যেক
সামাজিক নিয়ম দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্ত ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

* ইয়োরোপীরা যার এত বড়াই করে, সে ‘সভ্যতার উন্নতির’ (Progress of Civilization) মানে কি ?

তার মানে এই যে—সিদ্ধি, অমুচিতকে
 উচিত করে। চুরি, মিথ্যা, অথবা
 কৃশানী ও
 ইসলামী ধর্ম
 মানব জাতির
 উন্নতির সম্বন্ধে
 তুলনা
 Stanley দ্বারা সমভিব্যাহারী ক্ষুধার্ত
 মুসলমান রক্ষীদের এক গ্রাস অন্ন চুরি
 করার দরুণ চাবুকান এবং ফাঁসী, এ সকলের
 ঐচ্ছিক বিধান করে; ‘দূর হও, আমি ওথায় আসতে
 চাই’ রূপ বিখ্যাত ইয়োরোপী নীতি—যার দৃষ্টান্ত,
 যেথায় ইয়োরোপী-আগমন, সেথায়ই আদিম জাতির
 বিনাশ—সেই নীতির ঐচ্ছিক বিধান করে! এই
 সভ্যতার অগ্রসরণ লগুন নগরীতে বাভিচারকে, এবং
 পারিতে জ্রীপুত্রাদিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালান
 এবং আত্মহত্যা করাকে ‘সামান্য দৃষ্টতা’ জ্ঞান করে—
 ইত্যাদি।

এখন ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী ক্ষিপ্ত সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের প্রথম তিন শতাব্দীর তুলনা কর। খৃষ্টধর্ম প্রথম তিন শতাব্দীতে জগৎসমক্ষে আপনাকে পরিচিত কর্ত্তেও সমর্থ হয় নি, এবং যখন Constantine এর তলওয়ার একে রাজ্যমধ্যে স্থান

*পৃষ্ঠাপাদ বিবেকানন্দ স্বামীজির দেহত্যাগের পরে তাঁহার

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দিলে, সেদিন থেকে কোন্ কালে কৃষ্ণচানী ধর্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক সভ্যতা বিস্তারের কোন্ সাহায্য করেছে ? যে ইয়োরোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সচলা, কৃষ্ণচানধর্ম তাঁর কি পুরস্কার দিয়েছিল ? কোন্ বৈজ্ঞানিক কোন কালে • কৃষ্ণচানী ধর্মের অনুমোদিত কৃষ্ণচানী সম্ভের সাহিত্য কি দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিজ্ঞানের, শিল্প বা পণ্যকৌশলের অভাব পূরণ করতে পারে ? আজ পর্য্যন্ত ‘চর্চ’ প্রোফেন (ধর্ম ভিন্ন অন্য বিষয়বলম্বনে লিখিত) সাহিত্য প্রচারে অনুমতি দেন না। আজ যে মনুষ্যের বিদ্যা এবং বিজ্ঞানে প্রবেশ আছে, তার কি অকপট কৃষ্ণচান হওয়া সম্ভব ? New Testamentএ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোরাণ বা হাদিশের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়। ইউরোপের সর্বপ্রধান মনীষিগণ ইয়োরোপের ভলটেয়ার, ডারউইন, বুকনার, ফ্রমারিয়ণ, ভিক্টর হুগো-কুল বর্তমানকালে কৃষ্ণচানী দ্বারা কটু ভাষিত এবং অভিশপ্ত ; অপরদিকে এই সকল পুরুষকে

কাগজপত্রের সহিত ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’র এই অংশটুকু পাওয়া গিয়াছিল। সং।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ইসলাম বিবেচনা করেন যে, এই সকল পুরুষ আন্তিক, কেবল ইহাদের পয়গম্বর বিশ্বাসের অভাব। ধর্ম-সকলের উন্নতির বাধকত্ব বা সহায়কত্ব বিশেষরূপে পরীক্ষিত হউক, দেখা যাইবে, ইসলাম যেথায় গিয়াছে, সেথায়ই আদিমনিবাসীদের রক্ষা করেছে। সে সব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান।

খৃষ্টধর্ম কোথায় এমন কাজ দেখাতে পারে? স্পেনের আরাব, অস্ট্রেলিয়ার এবং আমেরিকার আদিমনিবাসীরা কোথায়? কুশচানেরা ইয়োরোপী যাহুদীদের কি দশা এখন করছে? এক দানসংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী ছাড়া ইয়োরোপের আর কোনও কার্য্যপদ্ধতি, গস্‌পেলের অনুমোদিত নয়—গস্‌পেলের বিরুদ্ধে সমুখিত। ইয়োরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই খ্রীষ্টধর্মের বিপক্ষে—বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ইয়োরোপে কুশচানীর শক্তি থাকত, তাহলে ‘পাস্তোর’ এবং ‘ককে’র স্থায় বৈজ্ঞানিক সকলকে জীবন্ত পোড়াত; এবং ডারউইনকল্পদের শূলে দিত। বর্তমান ইয়োরোপে কুশচানী আর সভ্যতা আলাদা জিনিষ। সভ্যতা, এখন তার প্রাচীন শত্রু কুশচানীর বিনাশের জন্ত, পাত্রিকুলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিছালয়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

এবং দাতব্যালয়সকল কেড়ে নিতে কটিবদ্ধ হয়েছে। যদি মূর্থ চাষার দল না থাকত, তাহলে কৃষানী তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ কর্তে সমর্থ হত না এবং সমূলে উৎপাটিত হত; কারণ, নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই কৃষানী ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু! এর সঙ্গে ইসলামের তুলনা কর। মুসলমান দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের উপরে সংস্থাপিত এবং ইসলামের ধর্মশিক্ষকেরা, সমস্ত রাজকর্মচারীদের বহুপূজিত এবং অস্ত্র ধর্মের শিক্ষকেরাও সম্মানিত।

পাশ্চাত্যদেশে লক্ষ্মী সরস্বতীর এখন কৃপা একত্রে। শুধু ভোগের জিনিষ সংযোগ হলেই এরা ক্ষান্ত নয়, কিন্তু সকল কাজই একটু সুচ্ছবি চায়। খাওয়া-দাওয়া ঘর-দোর সমস্তই একটু সুচ্ছবি দেখতে চায়। আমাদের দেশেও ঐ ভাব একদিন ছিল, যখন ধন ছিল! এখন একে দারিদ্র্য তার ওপর আমরা ‘ইতো-নষ্টস্ততোত্রঃ’ হয়ে যাচ্ছি। জাতীয় যে গুণগুলি ছিল তাও যাচ্ছে—পাশ্চাত্যদেশেরও কিছুই পাচ্ছিনি! চলাবসা কথাবার্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথচ পাশ্চাত্য কায়দা নেবারও সামর্থ্য নেই। পূজা পাঠ প্রভৃতি যা কিছু ছিল তা ত আমরা বানের জলে দিচ্ছি,—অথচ কালের উপযোগী একটা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

নতুন রকমের কিছু এখনও হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, আমরা এই মধ্যরেখার হৃদশায় এখন পড়ে। ভবিষ্যৎ বাঙ্গালা-দেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায় নি। বিশেষ হৃদশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোর আল্পোনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র করত। বাহার কোরে কলাপাতা কাটত, খাওয়া দাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত, সে সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র!! নতুন অবস্থা শিখতে হবে, কঠোর হবে কিন্তু তা বলে কি পুরোণগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি? নতুন ত শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যচচ্চড়ি!! কাজের বিছা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়ারগায়ে পুরোণ কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এসেগে। কল্কেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্যাস্ত গড়তে পারে না। দোর কি আগড় বোঝবার যো নেই!!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতি যন্ত্র কেনা!! এই অবস্থা সর্ববিষয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের যা ছিল তা ত সব যাচ্ছে, অথচ বিদেশী শেখবার মধ্যে বাক্য-যন্ত্রণা মাত্র!! খালি পুঁথি পড়ছ আর পুঁথি পড়ছ! আমাদের বাঙ্গালি আর বিলেতে আইরিস, এ দুটো এক ধাতের জাত। খালি বকাবকি করছে। বক্তৃতায় এ ছজাত বেজায় পটু। কাজের—এক পরসাত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

নয়—বাড়ার ভাগ দিনরাত পরস্পরে খেয়োখেয়ি কোরে মরছে !!!

পরিষ্কার সাজান গোজান এ দেশের এমন অভ্যাস যে অতি গরীব পর্য্যন্তরও ওবিষয়ে নজর। আর নজর কাজেই হতে হয়—পরিষ্কার কাপড় চোপড় না হলে তাকে যে কেউ কাজ কর্ত্ত্বই দেবে না। চাকর চাকরাণী রাঁধুনি সব ধপ্পে কাপড়—দিবারাত্র। ঘরদোর ঝেড়েঝুড়ে, ঘসেমেজে, ফিট্‌ফাট। এদের প্রধান সায়েস্তা এই যে, যেখানে সেখানে যা তা কখনও ফেলবে না। রান্নাঘর ঝক্‌ঝক্‌—কুট্‌নো ফুট্‌নো যা ফেলবার তা একটা পাত্রে ফেলছে, তারপর সেখান হতে দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। উঠানেও ফেলে না, রাস্তায়ও ফেলে না।

যাদের ধন আছে তাদের বাড়ীঘর ত দেখবার জিনিষ—দিনরাত সব ঝক্‌ঝক্‌! তার ওপর, নানা-প্রকার দেশবিদেশের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করেছে! আমাদের এখন ওদের মত শিল্পসংগ্রহে কাজ নেই, কিন্তু যেগুলো উৎসন্ন যাচ্ছে, সেগুলোকে একটু যত্ন কর্ত্ত্ব হবে? না—না? ওদের মত চিত্র বা ভাস্কর্য্য বিত্তা হতে আমাদের এখনও ঢের দেবী! ওহুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। আমাদের ঠাকুর দেবতা সব দেখ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

না, জগন্নাথেই মালুম !! বড্ড জোর ওদের (ইয়োরোপী-
দের) নকল কোরে একটা আধটা রবিবর্ষা দাঁড়ায় !!
তাদের চেয়ে দিশী চালচিত্রি করা পোটো ভাল—
তাদের কাছে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। সব রবিবর্ষা
ফর্ষা চিত্রি দেখলে লজ্জার মাথা কাটা যায় !! বরং
জয়পুরে সোণালী চিত্রি, আর হুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি
প্রভৃতি আছে ভাল। ইউরোপী ভাস্কর্য্য চিত্র প্রভৃতির
কথা বারাস্তরে উদাহরণ সহিত বলবার রইল। সে
এক প্রকাণ্ড বিষয়।



